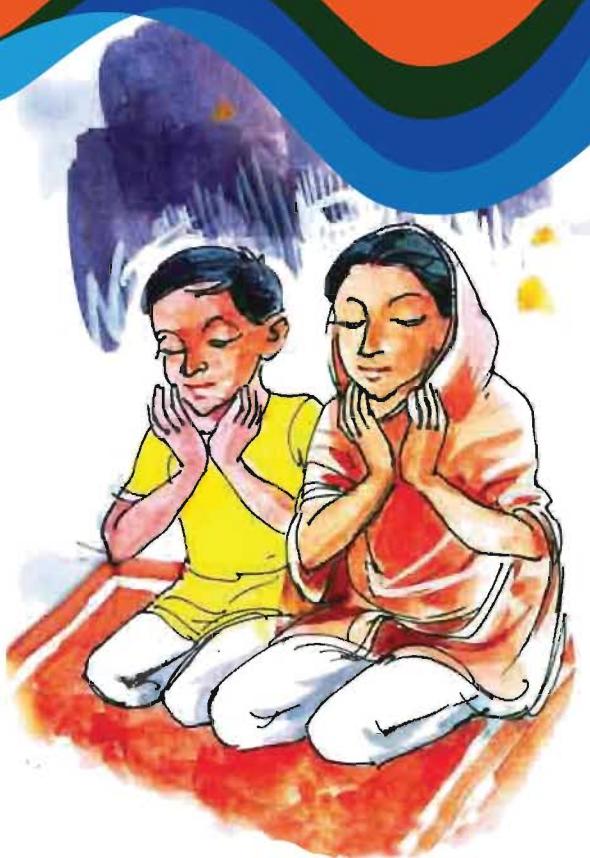


আমার বাংলা বই

ইতেড়ায়ি
পঞ্চম শ্রেণি



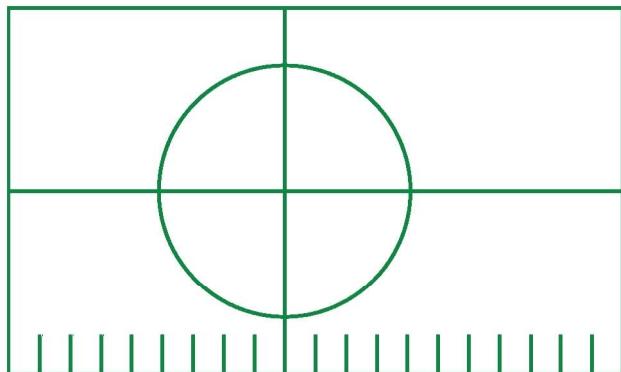
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি



দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত $10 : 6$ । অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য 305 সেমি (10 ফুট) হয়, প্রস্থ 183 সেমি (6 ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের 20 ভাগের 9 ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

305 সেমি \times 183 সেমি ($10' \times 6'$)

152 সেমি \times 91 সেমি ($5' \times 3'$)

76 সেমি \times 46 সেমি ($2\frac{1}{2}' \times 1\frac{1}{2}'$)

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে স্বাগে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অস্ত্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী মেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে স্বাগে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে স্বাগে পাগল করে,
ও মা, অস্ত্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী মেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলুপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

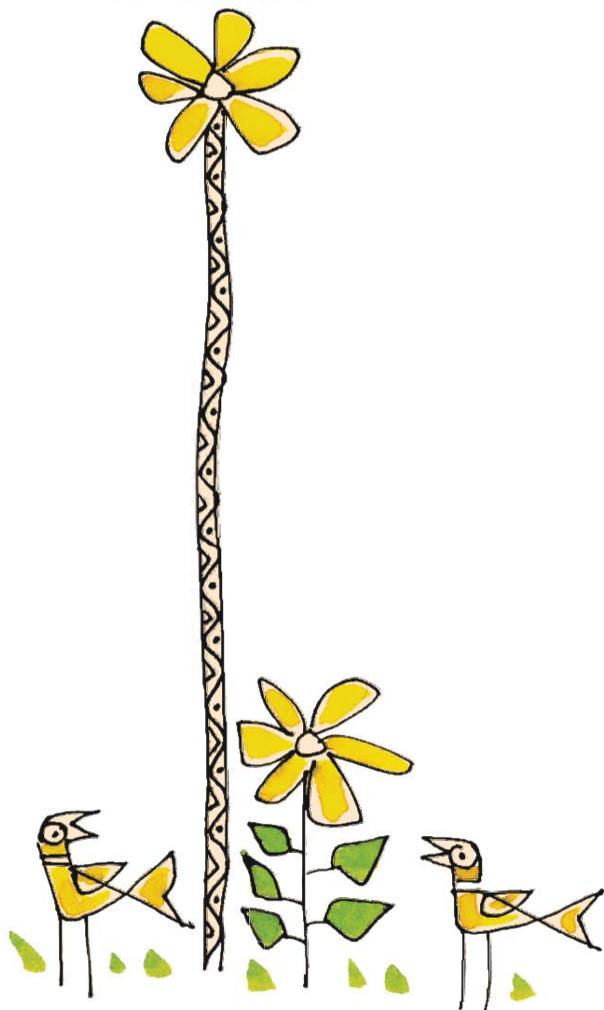
ইবতেদায়ি
পঞ্চম শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

হয়াৎ মামুদ
মহাম্মদ দানীউল হক
ড. মাসুদজ্জামান

শির সম্পাদনা

হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিষয়। তার সেই বিষয়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞান শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষার্থীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিষয়বোধ, অসীম কৌতুহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃক্ষির সুষৃষ্টি বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠে শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যয় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠ যথাসম্ভব নির্ভার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সাবলীল বাক্য। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলভিত্তিক পাঠ ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্য পাঠের শেষে অনুশীলনমূলক কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী জীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যকৰ্ম শুরু করে, যা একটি ব্যক্তিগতি প্রয়াস। প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তিত একুশটি পাঠ্যপুস্তক ২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড মাদরাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে গ্রহণ করেছে। শিক্ষায় বৈষম্য দূরীকরণে সরকার ইবতেদায়ি স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করছে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বত্ত্ব প্রয়াস ও সর্তর্কতা থাকা সঙ্গেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্ছুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংজ্ঞাত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপর্যুক্ত হবে বলে আশা করছি।

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

পঞ্চম শ্রেণির বাল্লা পাঠ্যপুস্তকে ভাষা শিখনে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পাঠ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কল্পনা-নির্ভর ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষা-গরিমঙ্গল বিবেচনা করে পাঠ নির্বাচন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ভাষা শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জীবন-ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে (Whole Language Approach) ভাষা শিখনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণির এ পর্যায়ে ভাষা শিখনের বিশেষ করে পড়ার ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ পাঠ্যপুস্তকে ভাষা দক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক শিখন-অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করবেন :

শোনা ও বলা

শ্রেণিকক্ষে শোনা ও বলা সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন :

- শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী শুনতে পারে এমন শুন্তিগ্রাহ্য স্বরে, স্পষ্টভাবে ও প্রমিত উচ্চারণে কথা বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শুনতে বলবেন;
- চিন্তার উদ্বেক করে এমন প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন;
- চিন্তা করতে ও পর্যাঙ্গ কথা বলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিমত, মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

পড়া

পঞ্চম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত পর্যায়ে পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো :

- শুন্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়া;
- শুন্ধ উচ্চারণে শব্দ পড়া;
- শব্দের বানান, অর্থ ও বাক্য পড়া;
- ঠিক গতিতে বিরামচিহ্ন মেনে বাক্য পড়া ও অর্থোন্ধার করা;
- অনুচ্ছেদ পড়ে অর্থোন্ধার করা;
- পড়া সংশ্লিষ্ট শিখন-অনুশীলনী সম্পন্ন করা;
- যুক্তব্যঞ্জন স্পষ্ট ও শুন্ধ উচ্চারণে পড়া।

লেখা

শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় শিখতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে লেখার কাজ এককভাবে করাতে পারেন। শিক্ষক জুটিতে এমনকি দলেও শিক্ষার্থীদের লেখার কাজ করাতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজের মতামত নিজের ভাষায় লেখার দক্ষতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। শিক্ষার্থীরা সহজ বাক্যে নিজেদের পছন্দমতো শব্দ দিয়ে লেখার কাজ শুরু করতে পারে।

শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্দেশনা

ভাষা শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিচের নির্দেশনা ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যপুস্তককে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। পঠনের জন্য প্রতিটি পাঠের শেষে ভাষা শিখনের জন্য সহায়ক কর্মকাণ্ড রয়েছে। পড়ার জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠ শেষে শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রতিটি পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় থাকবে। পর্যায় তিনটি হচ্ছে :

পর্যায় ১: নির্ধারিত পাঠের অর্থ উন্দ্বারের পর্যায়

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর নিজের আগ্রহ, বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক ভাষা শিখন-শেখানোর জন্য ব্যবহার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। এটি মূলত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের অর্থ বুঝতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।

পর্যায় ২: ভাষা-শিখন সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা

এটি মূলত শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা শিখনের জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ভাষা-দক্ষতা হিসেবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা-সংশ্লিষ্ট শিখন কর্মকাণ্ডে সম্মত হবে। শিক্ষক এ পর্যায়ে ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে সম্মৃত করাবেন।

পর্যায় ৩: অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সম্মতা উন্নয়নের পর্যায়

এ পর্যায়ে নির্ধারিত পাঠ থেকে অর্জিত শিখন শিক্ষার্থীরা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। এ পর্যায়ে শিক্ষক জীবন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত শিখন ব্যবহারে শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করবেন। অর্জিত শিখন যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে - তা এই পর্যায়ের শিখন-শেখানোর কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন :

১. নির্ধারিত পাঠের অর্থ উচ্চারের পর্যায়

এ পর্যায়ে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন:

- প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠ শুনু করা;
- পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি বিশ্লেষণ করা;
- সম্ভাব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আলোচনা করা;
- পাঠের শিরোনাম পড়তে বলা;
- পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঠের শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাওয়া;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শুনু, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে নির্ধারিত পাঠ পড়া;
- শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া ও পঠিত অংশের অর্থ অনুধাবন করার সুযোগ প্রদান;
- পাঠের নির্ধারিত অংশের মূল শব্দ চিহ্নিত করতে বলা ও সংশ্লিষ্ট বাক্য সরবে পড়তে বলা;
- প্রশ্ন করতে ও মতামত প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

২. ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শিক্ষক পরিচালনা করবেন। পাঠের শিখনফলের সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন শিখন-কর্মকাণ্ডের (learning activities) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষা-দক্ষতা অর্জনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হচ্ছে :

- নতুন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ ও যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ গঠন;
- পাঠ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-উত্তর বলা ও লেখা;
- বিপরীত শব্দ জানা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ;
- জোড় শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি;
- বিরামচিহ্ন হিসেবে দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক সম্পর্কে জানা ও বাক্যে তা ব্যবহার;
- কথোপকথনভিত্তিক বাক্য বলা ও লেখা;
- ছবি দেখে বাক্য বলা ও লেখা;
- নির্ধারিত বিষয়বস্তু যেমন-নদী, খাতু, প্রিয় প্রণী ইত্যাদি সম্পর্কে একাধিক বাক্য লেখা;
- পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সমমানের গল্প, কবিতা বলা;
- নিজের ভাষায় পঠিত বিষয়বস্তু বলা ইত্যাদি।

টাল্লিখিত শিখন-কর্মকাণ্ডে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাবেন। প্রতিটি শিখন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত চৰ্চার সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের সাথে এ পর্যায়ে শিখন-কর্মকাণ্ডসমূহ শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে পরিচালনা করবেন। শব্দের অর্থ আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানা, জীবন-ঘনিষ্ঠ উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষক অর্থ আলোচনা করবেন। যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ দেখিয়ে তারপর শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বর্ণ তেওঁে দেখাবেন। নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে একাধিক শব্দ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের থেকে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ সম্পর্কে শিক্ষক জানতে চাইবেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানোর জন্য শিক্ষক দেয়ালে অর্থসহ নতুন শব্দ

এবং বিশ্লেষণসহ যুক্তবর্ণের তালিকা দেয়ালে টানিয়ে রাখতে পারেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণের দেয়াল-তালিকা শিক্ষার্থীদের শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখনকে সহজ ও কার্যকর করতে সহায়তা করবে। নতুন পাঠের সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিক্ষক নিয়মিত তালিকায় যুক্ত করতে পারেন।

৩. অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সম্ভাবনা উন্নয়নের পর্যায়

এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের পর্যায়। এ পর্যায়ে অর্জিত শিখনের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় লিখবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী মুক্তভাবে নিজের ভাষায় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্বর্কে লিখবে। পাঠের উন্নত লেখার সাথে এ ধরনের লেখার পার্থক্য হলো, এ লেখা শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন ও অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে লেখায় নিজের জানা শব্দ ব্যবহারের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীকে পাঠে পড়ানো হয়নি এমন শব্দও যদি শিক্ষার্থী এ ধরনের লেখায় ব্যবহার করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। লেখায় সৃজনশীলতার জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক প্রশংসন করবেন। লেখায় বানান ভুল করলে সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক সুযোগ দেবেন। বানান শুন্ধ হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রশংসন করবেন।

শিক্ষার্থী যখন নিজের ভাষায় লেখা শেষ করবে শিক্ষক তখন তা সরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে লেখা বিনিময় করবে এবং একে অপরের লেখা সরবে পড়বে।

ভাষা-শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে জন্য শিখন-কর্মকাণ্ডে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন। ভাষাদক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা পারস্পরিকভাবে সম্বর্ক্যুক্ত। কাজেই সামগ্রিক ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্বান্বোধ করবেন। ভাষা শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডগুলি যাতে যৌক্তিক হয়, শিক্ষককে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের ভাষা শিখনে যাতে সহায়ক হয় শিক্ষক সে ব্যাপারে যত্নবান হবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মাঝে সংগঠিত সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ড ভাষা-শিখনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই ভাষা-শিখন-শেখানোর সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ামূলক (interactive) কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অবাধ সুযোগ থাকবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক একটি সক্রিয় শিখন পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীর জীবনঘনিষ্ঠ প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে ভাষা-শিখন শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুঠী ও কার্যকর ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।



সূচিপত্র

বিষয়

	পৃষ্ঠা
১. এই দেশ এই মানুষ	১
২. সংকল্প	৬
৩. সুন্দরবনের প্রাণী	১০
৪. হাতি আর শিয়ালের গল্প	১৬
৫. ফুটবল খেলোয়াড়	২২
৬. বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ	২৬
৭. ফেব্রুয়ারির গান	৩১
৮. শখের মৃৎশিল্প	৩৪
৯. শব্দদূষণ	৪১
১০. অরণীয় যাঁরা চিরদিন	৪৪
১১. স্বদেশ	৫০
১২. কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা	৫৬
১৩. অবাক জলপান	৬৪
১৪. ঘাসফুল	৭৩
১৫. মাটির নিচে যে শহর	৭৬
১৬. শিক্ষাগুরুর মর্যাদা	৮১
১৭. ভাবুক ছেলেটি	৮৫
১৮. দুই তীরে	৯১
১৯. বিদায় হজ	৯৫
২০. দেখে এলাম নায়াগ্রা	১০১
২১. রৌদ্র লেখে জয়	১০৬
২২. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	১০৯
২৩. শহিদ তিতুমীর	১১৫
২৪. অপেক্ষা	১২০
● শব্দের অর্থ জেনে নিই	১৩০

এই দেশ এই মানুষ

“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।” কবির এ কথার অর্থ – আমাদের সৌভাগ্য ও সার্থকতা যে আমরা এদেশে জন্মেছি। বাঙালি আমরা। বাংলাদেশের প্রায় সকল লোক বাংলায় কথা বলে। তবে আমাদের দেশে যেমন রয়েছে প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তেমনি রয়েছে মানুষ ও ভাষার বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসম্প্রদার লোকজন। এদের কেউ চাকমা, কেউ মারমা, কেউ মুরং, কেউ তঞ্জাই ইত্যাদি। এছাড়া রাজশাহী আর জামালপুরে রয়েছে সাঁওতাল ও রাজবংশীদের বসবাস। তাদের রয়েছে নিজ নিজ ভাষা। একই দেশ, অথচ কত বৈচিত্র্য। এটাই বাংলাদেশের গৌরব। সবাই সবার বন্ধু, আপনজন। এদেশে রয়েছে নানা ধর্মের লোক। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। সবাই মিলেমিশে আছে যুগ যুগ ধরে। এরকম খুব কম দেশেই আছে। আবার আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক বাঙালি আছে।



বাংলাদেশের এই যে মানুষ, তাদের পেশাও কত বিচ্ছিন্ন। কেউ জেলে, কেউ কুমার, কেউ কৃষক, কেউ আবার কাজ করে অফিস-আদালতে। সবাই আমরা পরস্পরের বন্ধু। একজন তার কাজ দিয়ে আরেকজনকে সাহায্য করছে। গড়ে তুলছে এই দেশ।

তাবো তো কৃষকের কথা। তারা কাজ না করলে আমাদের খাদ্য জোগাত কে? সবাইকে তাই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। সবাই আমাদের আপনজন।

আমাদের আছে নানা ধরনের উৎসব। মুসলমানদের রয়েছে দুটি ঈদ, ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা। হিন্দুদের দুর্গা পূজাসহ আছে নানা উৎসব আর পার্বণ। বৌদ্ধদের আছে বুধ পূর্ণিমা। খ্রিস্টানদের আছে ইস্টার সানডে আর বড় দিন। এছাড়াও রয়েছে নানা উৎসব। পঙ্গেলা বৈশাখ- নববর্ষের উৎসব। রয়েছে রাখাইনদের সাংগ্রাই ও চাকমাদের বিজু উৎসব। ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার।



পঙ্গেলা বৈশাখের উৎসব



পার্বত্য জেলার ঘরবাড়ি

পোশাক-পরিচ্ছদও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন ভিন্ন ধাচের। মিল আমাদের একটা জায়গায়-সকলেই আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী।

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জনজীবন তাই ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের বেশাভূমি। এজন্য দেশের নানা প্রান্ত যেমন ঘুরে দেখা দরকার তেমনি দরকার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া, পরস্পর মেলামেশা করা। কাছাকাছি আসা, মানুষকে ভালোবাসা।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র— এইসব। দেশ হলো জননীর মতো। জননী যেমন দ্রুহ, মতা ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন। দেশও তেমনই তার আঙো, বাতাস ও সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এদেশকে আমরা ভালোবাসব।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

সৌভাগ্য প্রকৃতি বৈচিত্র্য বেলাভূমি প্রান্তর স্বজন সার্থক সাহাই বিজু

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রকৃতি সৌভাগ্য বৈচিত্র্য বেলাভূমি প্রান্তর সার্থক

ক. আমাদের যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

খ. আমাদের দেশে রয়েছে সুন্দর।

গ. কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায়-বা এর সমুদ্রের।

ঘ. একই দেশ, অথচ কত।

ঙ. দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, , পাহাড়, সমুদ্র- এইসব।

চ. দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া আর কারা বাস করে?

খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের উৎসবগুলোর নাম কী?

গ. বাংলাদেশের জনজীবনের বৈচিত্র্যসমূহ কী কী?

ঘ. “দেশ হলো জননীর মতো।” দেশকে জননীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?

ঙ. জেলেদের পেশা কী? তারা যদি কাজ না করে তাহলে আমাদের কী হতে পারে?

চ. “ধর্ম যার যার উৎসব যেন সবার।” – এ কথার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ছ. দেশকে কেন ভালোবাসতে হবে?

৪. নিচের অনুচ্ছেদ অবলম্বনে তিটি প্রশ্ন তৈরি করি।

দেশ মানে এর মানুষ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, পাহাড়, সমুদ্র- এইসব। দেশ হলো জননীর মতো। মা যেমন আমাদের দ্রেহমতা, ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন, দেশও তেমনই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এ দেশকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

৫. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বাঙালি অবাঙালি

বন্ধু শত্রু

দেশ বিদেশ

সার্থকতা ব্যর্থতা

ক. আমাদের বাংলাদেশের বাইরেও অনেক আছে।

খ. আমরা সবাই পরস্পরের।

গ. হলো জননীর মতো।

ঘ. আমাদের যে আমরা এদেশে জন্মেছি।

৬. নিচের বাক্য কয়টি পড়ি।

মনির খুব ভালো ছেলে। রবিন তার বন্ধু। মনির ও রবিন একত্রে মাঠে খেলে।

এখানে,	মনির, রবিন	- বিশেষ্য পদ
খুব ভালো	- বিশেষণ পদ	
তার	- সর্বনাম পদ	
ও	- অব্যয় পদ	
খেলে	- ক্রিয়া পদ	

এবার নিচের বাক্য কয়টি থেকে ৫ ধরনের পদ খুঁজে বের করি।

“বাংলাদেশের জনজীবন ভারি বৈচিত্র্যময়। এই দেশকে তাই ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার। এজন্য দরকার দেশের নানা প্রান্তে আতীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া। উচিত সবার সবাইকে ভালোবাসা।”

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. বাংলাদেশের যেকোনো উৎসব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

খ. শিক্ষকের নির্দেশনায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (৩ দিন/৪ দিন পরপর)

টেলিভিশন/রেডিও/খবরের কাগজে প্রচারিত সংবাদ দেখে/শুনে/পড়ে নিচের ছক অনুযায়ী আলাদা কাগজে তা লিখে আনি। পরে শ্রেণিতে পড়ে শোনাই ও অন্যদের লেখা শুনি।

তারিখ	আনন্দের সংবাদ	দুঃখের সংবাদ	খেলার সংবাদ

সংকল্প

কাজী নজরুল ইসলাম

থাকব না কো বন্ধ ঘরে
 দেখব এবার জগৎকাকে,—
 কেমন করে ঘুরছে মানুষ
 যুগান্তৱের ঘূর্ণিপাকে।
 দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
 ছুটছে তারা কেমন করে,
 কিসের নেশায় কেমন করে
 মরছে যে বীর লাখে লাখে,
 কিসের আশায় করছে তারা
 বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে॥

হাউই চড়ে চায় যেতে কে
 চন্দ্রলোকের অচিন্পুরে;
 শুনব আমি, ইঙ্গিত কোন্
 মঙ্গল হতে আসছে উড়ে॥
 পাতাল ফেড়ে নামব নিচে
 উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
 বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি
 আপন হাতের মুঠোয় পুরে॥

(সংক্ষেপিত)



অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

অসীম বিশ্বকে জানার এক অদম্য কৌতুহল মানুষের। কিশোরেরও তাই। সে জানতে চায় বিশ্বের সকল কিছুকে। আবিষ্কার করতে চায় অসীম আকাশের সকল অজানা রহস্যকে। সে বুঝতে চায় কেন মানুষ ছুটছে অসীমে, অতলে, অভরীক্ষে। বীর কেন জীবনকে অনায়াসে উৎসর্গ করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে। সে জানতে চায় দুঃসাহসী কেন উড়ছে। তাই কিশোর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে-সে বন্ধ ঘরে বসে থাকবে না। পৃথিবীটাকে সেও ঘুরে ঘুরে দেখবে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

সংকল্প বন্ধ যুগান্তর দেশাত্তর বরণ মরণ-যন্ত্রণা দুঃসাহসী চন্দ্রগোক
অচিনপুর ফেড়ে



৩. একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ শিখি ও বাক্য তৈরি করি।

সংকল্প	-	প্রতিজ্ঞা	ভালো কাজের জন্য সবাইকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত।
বন্ধ	-	বন্ধ	ইঙ্গিত
দেশান্তর	-	অন্যদেশ	বরণ
জগৎ	-	পৃথিবী	সাদরে গ্রহণ

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও শিখি।

- ক. কবি বন্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?
- খ. যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘূরছে বলতে কী বোঝ লেখ?
- গ. চন্দ্রগুলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়?
- ঘ. কিসের আশায় বীর মরণকে বরণ করছে?
- ঙ. কবি হাতের মুঠোয় পুরে কী এবং কেন দেখতে চান?

৫. ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ শিখি।

চলিত রূপ	সাধু রূপ	চলিত রূপ	সাধু রূপ
ঁকিব	ঁকিব	ছুটছে	ছুটিতেছে
দেখিব	দেখিব	আসছে	আসিতেছে
ঘূরিছে	ঘূরিতেছে	চলছে	চলিতেছে
মরিছে	মরিতেছে		

৬. ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে জেনে নিই।

ক. আমি কাজটি করি।

আমি কাজটি করেছিলাম।

আমি কাজটি করব।

উপরের বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত করি, করেছিলাম ও করব— এগুলো ‘করা’ ক্রিয়াপদটির বিভিন্নরূপ।

যে সময়ে ক্রিয়া বা কাজটি সম্পন্ন হয় সেই সময়টিকেই ক্রিয়ার কাল বোঝানো হয়েছে।

যেমন বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল।

খ. নিচের বাক্যের ক্রিয়াবাচক শব্দগুলোর নিচে দাগ দিই।

আমি বড় হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।

আমি আমার দক্ষতা অন্যের উপকারে ব্যবহার করি।

କିଶୋର ବର୍ଷାକାଳେ ତାର ଗ୍ରାମେ ଗାଛ ଲାଗାବେ ।

তরুণ চিকিৎসক হবে। মানুষের চিকিৎসা করবে।

গ. নিচের ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়াপদগুলোকে বর্তমান ও অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদে
রূপান্তর করি।

থাকব, দেখব, শুনব, খাব, বেড়াব, ঘূরব, পড়ব, খেলব, চড়ব, নামব, ধরব, হসব

ଭବିଷ୍ୟତ

বর্তমান

ଅତୀତ

୩୮

ଥାକୁ

ଥେରେଟିକ୍ସମ

৭. শব্দগলোর বানান লিখি।

বরণ, মরণ, যন্ত্রণা (র-এর পরে ‘ণ’ বসে), বন্ধ, যুগান্তর, দেশান্তর, বিশ্ব-জগৎ, ইঙ্গিত।

৮. কবির সংকল্পগলো লিখি।

৭. আমার সংকল্পগলো লিখি।

১০. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও মুখ্য লিখি।



କବି ପରିଚିତ

কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ ২৫শে, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ,
(১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সন)। তিনি ‘বিদ্রোহী কবি’ নামেই বেশি
পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

তাঁর কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিশুদের জন্য তিনি অনেক গান, কবিতা, ছড়া ও নাটক লিখেছেন। ‘অগ্নি-বীণা’, ‘বিষের বাঁশী’, ‘ঝিঙে ফুল’ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সন) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সুন্দরবনের প্রাণী

বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে প্রকৃতির অপার সম্ভাবন সুন্দরবন। সমুদ্রের কোল ধৈঁয়ে গড়ে উঠেছে এই বিশাল বন। এখানে রয়েছে যেমন প্রচুর গাছপালা, কেওড়া ও সুন্দরী গাছের বন, তেমনি রয়েছে নানা প্রাণী, জীবজন্ম।



রয়েল বেঙ্গল টাইগার

বিশ্বের কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের নাম বা জায়গার নাম। যেমন, ক্যাঞ্চারু বললেই মনে পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার কথা। সিংহ বললেই মনে ভেসে ওঠে আফ্রিকার কথা। তেমনি বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা রাজকীয় বাঘের নাম। এই বাঘ থাকে সুন্দরবনে। এ বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি আবার ভয়ঙ্কর। এর চালচলনও রাজাৰ মতো। সুন্দরবনের ভেজা স্যাতসেতে গোলপাতার বনে এ বাঘ ঘুরে বেড়ায়।

শিকার করে জীবজন্ম, সুযোগ পেলে মানুষও খায়। এক সময় সুন্দরবনে ছিল চিতাবাঘ ও ওলবাঘ। কিন্তু এখন আর এসব বাঘ দেখা যায় না। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের অমৃত্যু সম্পদ। এ বাঘকে বিলুপ্তির হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে হবে।

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিৎ, কোনোটার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ। এক সময় সুন্দরবনে প্রচুর গণ্ডার ছিল, ছিল হাতি, ছিল বুনো শুয়োর। এখন এসব প্রাণী আর নেই। তবে দেশের রাঙামাটি আর বান্দরবানের জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়।

যেকোনো দেশের জন্যই জীবজন্ম, পশুপাখি এক অমৃত্যু সম্পদ। দেশের জলবায়ু আবহাওয়া গাছপালা বৃক্ষলতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিমগ্নিতে সে দেশের প্রাণিকূল জীবনধারণ করে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় প্রাণী বা বৃক্ষলতা বলতে কিছুই নেই। একসময় আমাদের দেশে প্রচুর শকুন দেখা যেত। শকুন দেখতে যে খুব সুন্দর পাখি তা কিন্তু নয়। এরা উড়ে বেড়ায় আকাশের অনেক উপরে। বাসা করে গাছের ডালে। মানুষের পক্ষে যা স্ফুরিত, সেইসব আবর্জনা শকুন খায় এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু শকুন এখন বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় পাখি।

প্রাণী বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান। তাকে ধ্বংস করতে নেই। ধ্বংস করলে নেমে আসে নানা বিপর্যয়—বন্যা, খরা, ঝড় ইত্যাদি।



চিত্রা হরিণ



গণ্ডার



হাতি



শকুন



মদন টাক



বুনো শুয়োর

পশুপাথি ও জীবজন্ম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। প্রকৃতিতে যদি বিপর্যয় ঘটে তবে এদের জীবনও বিপন্ন হয়। সুন্দরবনের অনেক প্রাণী প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেসব প্রাণী আছে তাদের বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অপার সম্ভার রয়েল ভয়ঙ্কর অমূল্য বিলুপ্তপ্রায়

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অমূল্য অপার সম্ভার রয়েল ভয়ঙ্কর বিলুপ্ত

ক. বাংলাদেশ সৌন্দর্যে ভরপুর।

খ. প্রকৃতির অপার সমুদ্রের নিচে রয়েছে।

গ. বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেঙ্গল টাইগার।

ঘ. বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি আবার।

ঙ. রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের সম্পদ।

চ. শকুন বাংলাদেশে এখন পাখি।

৩. কথাগুলো বুঝে নিই।

অস্ট্রেলিয়া	এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মতো একটি মহাদেশ।
ক্যাঙ্গারু	একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া যায় এমন একটি প্রাণী। এদের চারটি পা, কিন্তু পেছনের দু-পা বড় আর সামনের দু-পা ছোট। এর ফলে অন্যান্য চতুর্ষিংহ প্রাণীর মতো এরা ইঁটাচলা করতে পারে না, পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ক্যাঙ্গারু তার বুকের নিচে একটা থলিতে বাচ্চা রাখে।
চিতাবাঘ	এক প্রকার বাঘ। অন্য বাঘের সঙ্গে চিতাবাঘের পার্থক্য হলো, চিতাবাঘ অন্যান্য বাঘের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে ও গাছে উঠতে পারে।
গণ্ডার	কালো বা ধূসর রঙের চতুর্ষিংহ প্রাণী, উচ্চতায় ও লম্বায় গরুর আকারের। এদের নাকের ওপরে শিং থাকে।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ক্যাঞ্চারু ও সিংহ বললেই কোন কোন দেশের কথা মনে হয়?

খ. বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।

গ. দেশের জন্য পশুপাখি, জীবজন্তু কী উপকার করে তা নিজের ভাষায় লেখ।

ঘ. শকুন কীভাবে মানুষের উপকার করে?

ঙ. পশুপাখি জীবজন্তু না থাকলে প্রকৃতির কী বিপর্যয় ঘটবে বলে তোমার মনে হয়?

৫. নিচের বাক্য দুটি পড়ি।

মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর সেইসব আবর্জনা শকুন খেয়ে ফেলে। সে সত্যিকার অর্থে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না।

উপরের বাক্য দুটিতে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই এক-একটি পদ :

শকুন বিশেষ্য পদ

କ୍ଷତିକର ବିଶେଷଣ ପଦ

সে সর্বনাম পদ

খায় ক্রিয়া পদ

ছাড়া অব্যয় পদ

পদ পাঁচ প্রকার: বিশেষ, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়।
নিচের বাক্যগুলোতে কী কী পদ আছে তা লেখ।
সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিং, কোনোটার গায়ে
ফোটা ফোটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ।

৬. নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোনো একটি প্রাণী সম্পর্কে রচনা লিখি।

ক. আকৃতি -

ଘ. ଆବ୍ସମ୍ବଲ -

୩୯-

୫. ଖାଦ୍ୟଭ୍ୟାସ -

গ. কোথায় দেখা যায় -

৭. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যে দেশের কথা-

- | | |
|-----------------|-------------|
| ১. ভারত | ২. বাংলাদেশ |
| ৩. অস্ট্রেলিয়া | ৪. আফ্রিকা |

খ. আফ্রিকার কথা উঠলে কোন প্রাণীর কথা মনে হয়?

- | | |
|---------|---------|
| ১. সিংহ | ২. হাতি |
| ৩. বাঘ | ৪. উট |

গ. বাংলাদেশের কোন জঙ্গলে হাতি দেখতে পাওয়া যায়?

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ১. সিলেট ও খুলনার | ২. ভাওয়াল ও মধুপুরের |
| ৩. রাঙামাটি ও বান্দরবানের | ৪. উপরের সবখানে |

ঘ. কোন পাথি ক্ষতিকর আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে?

- | | |
|--------|---------|
| ১. ঈগল | ২. শকুন |
| ৩. চিল | ৪. কাক |

ঙ. কোন প্রাণীর গায়ে ফেঁটা ফেঁটা সাদা দাগ ও বড় শিং আছে?

- | | |
|-------------|----------------|
| ১. চিতা বাঘ | ২. চিত্রা হরিণ |
| ৩. ভালুক | ৪. গণ্ডার |

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমি এমন প্রাণীদের একটি তালিকা তৈরি করি- যাদের নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখি নি।
পরে শ্রেণির স্বার সাথে তা মিলিয়ে দেখি।

হাতি আৱ শিয়ালেৰ গল্প

সে অনেক-অনেক দিন আগেৰ কথা। চারদিকে তখন কী সুন্দৰ সবুজ বন, ঝোপঝাড়। আৱ দিগন্তে ঝুকে পড়া নীল আকাশেৰ ছোঁয়া। এৱেকম দিনগুলোতে মানুষেৱা থাকত লোকালয়ে আৱ পশুৰা জঙ্গলে।

মানুষ তখন একটু একটু কৱে সভ্য হচ্ছে। কী কৱে সবাৱ সংজ্ঞে মিলেমিশে থাকা যায়, শিখছে সেইসব কায়দাকানুন। ও-দিকে বনে বনে তখন পশুদেৱ রাজত্ব। হাজাৱ রকমেৰ প্ৰাণী, অসংখ্য পাখ-পাখালি। বেশ শান্তিতেই কাটছিল বনেৰ পাথি আৱ প্ৰাণীদেৱ দিনগুলো। কিন্তু একদিন হলো কি তাড়া খেয়ে মন্ত একটা হাতি এই বনে ঢুকে পড়ল। হাতিটাৱ সে-কী বিশাল শৱীৱ। পাগুলো বটপাকুড় গাছেৰ মতো মোটা। শুঁড় এতটাই লম্বা যে আকাশেৰ গায়ে গিয়ে বুঁৰি ঠেকবে। তাৱ গায়েও অসীম জোৱ। এই শৱীৱ আৱ শক্তি নিয়েই তাৱ যত অহংকাৱ। মেজাজটাও দারুণ তিৱিক্ষি।



তো-যেই-না হাতিটার ঐ বনে ঢোকা, অমনি শুরু হয়ে গেল তোলপাড়। নতুন অতিথি এসেছে, সবাই স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু ঐ দুষ্টু হাতিটার সে-কী তুলকালাম কাও! খুব জোরে গলা ফাটিয়ে দিল প্রচণ্ড একটা হুজ্জার। থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত বন। গাছে গাছে পরম নিশ্চিতে বসেছিল পাথি, তারা ভয়ে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল। মাটির তলায় লুকিয়ে ছিল যে ইন্দুর, গুব্রে পোকার দল। তারা বুবাতে চাইল কী এমন ঘটল যে এমন করে কেঁপে উঠল মেদিনী?

হাতিটা এমন ভাব করতে শুরু করল, সেই বুঝি বনের রাজা। গুরুগন্ধীর ভারিক্ষি চালের কেশের দোলানো অমিত শক্তিধর সিংহ। সেও হাতিটার কাছে আসতে ভয় পায়। হালুম বাঘ মামা, সেও হাতিটার ধারে-কাছে ঘেঁষতে চায় না। বনের সবাই ভয়ে তটস্থ, শক্তিকৃত। কখন জানি কী হয়!

একবার তো কী জানি কী হয়েছে। নিরীহ একটা হরিণকে শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। আরেকবার ছেউ একটা পিপড়ে পায়ের তলায় পিয়ে মেরে ফেলল। সেই থেকে বনের কোনো প্রাণী হাতিটার ছায়াও মাড়াত না। দিনে দিনে হাতিটা হয়ে উঠল আরও অহংকারী। এই নিয়ে বনের কারো মনে শান্তি নেই।

কিন্তু এভাবে কি দিন যায়? এক সন্ধিয়ায় বনের সব প্রাণী এসে জড়ো হলো সিংহের গুহায়। এর একটা বিহিত চাই, সবার মুখে এক কথা। বাঘ, ভালুক, সিংহ, বানর, হরিণ, বনবিড়ল, শিয়াল সবাই সলা-পরামর্শ করতে বসল। শেষে সবাই মিলে শিয়ালের উপরেই ভার দিল।

দিন আসে, দিন যায়। একদিন শিয়াল ভয়ে ভয়ে হাজির হলো হাতির আস্তানায়। লেজ গুটিয়ে একটা সালাম দিল। বলল, আপনিই তো বনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী। আপনিই আমাদের রাজা। ওই দেখুন, নদীর ওপারে সবাই উদ্ঘৰীব হয়ে বসে আছে। আপনাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নিতে চায় সবাই।

হাতি তো শিয়ালের কথা শুনে মহা খুশি। আচ্ছা চল। নদীর পারে এসে শিয়াল বলল, এই আমি নদী সাঁতরে পার হচ্ছি। আপনিও আসুন। এই বলে শিয়াল নদীতে দিল ঝাঁপ। হাতি ভাবল, পুঁচকে শিয়াল যদি নদী পার হতে পারে, আমি পারব না কেন? সেও নদীতে নেমে পড়ল।

কিন্তু মস্ত বড় তার শরীর আর কী ভারী! হাতিটা নদীর পানিতে পা দিল। অমনি তার ভারী শরীর একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকল। তলিয়ে যেতে যেতে হাতি বলল, শিয়াল ভায়া, আমাকে বাঁচাও। শিয়াল ততক্ষণে নদী পার হয়ে তীরে উঠে এসেছে। বনের সমস্ত প্রাণী তার পেছনে এসে দাঁড়াল।

শিয়াল হাতিকে বলল, তোমাকে বাঁচাব আমরা? এতদিন তোমার অত্যাচারে আমরা কেউ বনে
শান্তিতে ঘুমাতে পারিনি। তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যেই তো নদীতে নিয়ে এসেছি। বনের
যত প্রাণী ছিল, সবাই শিয়ালের কথার প্রতিধ্বনি করে সমন্বয়ে বলে উঠল :

ঠিক বলেছ শিয়াল ভায়া
আর দেখব না হাতির ছায়া
আমরা এখন মুক্ত স্বাধীন
নাচছি সবাই তা-ধিন তা-ধিন।

(হিতোপদেশ অবলম্বনে)



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দিগন্ত অহংকার তিরিঞ্চি তুলকালাম কাণ্ড হুঙ্কার মেদিনী তটস্থ শক্তিত
শক্তিধর আস্তানা উদগ্রীব সমষ্টিরে

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দিগন্তের অহংকার তিরিঞ্চি তুলকালাম কাণ্ড হুঙ্কার মেদিনী তটস্থ শক্তিত

ক. বিদ্যুৎ চমকালে কেঁপে ওঠে বলে মনে হতে পারে।

খ. পতনের মূল।

গ. কী হয়েছে, এত হয়ে আছ কেন?

ঘ. বনের সিংহ দিলে মানুষের মনে ভয় জাগে।

ঙ. নিজের কলমটা খুঁজে না পেয়ে সে বাঁধিয়ে দিয়েছে।

চ. ওপারে কী আছে কেউ জানে না।

ছ. মেজাজ বলে তার কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না।

জ. তুমি এত কেন? কী হয়েছে?

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. অমিত শক্তিধর কাকে বলা হয়েছে?

খ. বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে আসার কারণ কী?

গ. গল্লে মুক্ত স্বাধীন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ঘ. শিয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের কী হতো ব্যাখ্যা কর।

ঙ. হাতির এই শাস্তির জন্য তার চরিত্রের কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে তুমি মনে কর।

চ. মানুষ যখন সভ্য হচ্ছে তখন মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন?

ছ. সবাই মিলে শিয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?

জ. শিয়াল কীভাবে বনের পশুপাখিকে রক্ষা করলো?

ঝ. অহংকারী ও অত্যাচারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়?

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সুন্দর	কৃৎসিত	অহংকার	নিরহংকার	ভয়	সাহস	স্বাধীন	পরাধীন
--------	--------	--------	----------	-----	------	---------	--------

ক. আমরা দেশের অধিবাসী।

খ. পতনের মূল।

গ. চেহারা নয়, আসল হলো মানুষের মন।

ঘ. মনে থাকলে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

৫. ঠিক উত্তরটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বনের সব প্রাণী কার কাছে এসে জড়ো হলো?

- | | |
|---------|-----------|
| ১. বাঘ | ২. শিয়াল |
| ৩. হাতি | ৪. সিংহ |



খ. কার জন্য বনে আবার শান্তি এলো?

- | | |
|----------|-----------|
| ১. সিংহ | ২. শিয়াল |
| ৩. ভালুক | ৪. বাঘ |

গ. হাতির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কেন শিয়ালকে দায়িত্ব দেয়া হলো?

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ১. শিয়াল সাঁতার জানে | ২. শিয়াল খুব সাহসী |
| ৩. শিয়াল বুদ্ধিমান | ৪. শিয়াল হাতির বন্ধু |

ঘ. হাতির করুণ পরিণতির জন্য দায়ী কোনটি?

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ১. হাতির অহংকার | ২. হাতির লম্বা শুঁড় |
| ৩. হাতির ভারী শরীর | ৪. হাতির বোকামি |

ঙ. হাতিকে বাঁচানোর জন্য কেউ এগিয়ে এলো না কেন?

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ১. হাতির অত্যাচারের জন্য | ২. হাতি খুব বড় বলে |
| ৩. হাতির ভয়ে | ৪. হাতি সাঁতার জানে বলে |

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

শান্তি	অশান্তি	অসৎ প্রতিবেশীর কারণে তার অশান্তি লেগেই আছে।
সভ্য
ধনি
শক্তিশালী

৭. নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন পদ লিখি।

দুর্ঘু	-	বিশেষণ
হাতি	-	
বুদ্ধিমান	-	
এবং	-	
আমি	-	
চায়	-	

৮. যেকোনো একটা প্রাণী সম্পর্কে বলি এবং পাঁচটি বাক্যের একটা অনুচ্ছেদ রচনা করি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

একটি গল্প লেখার চেষ্টা করি। প্রথমে শিক্ষকের সহায়তায় ২/৩টি সাদা কাগজ নিই। সেগুলোকে একটি ভাঁজ করে নোটবুকের মতো তৈরি করি। এখন প্রতিটি কাগজের এক পাশে নিচের দিকের অর্ধেক থেকে গল্প লেখা শুরু করি। আর উপরের অর্ধেকে নিজের খুশিমতো ছবি আঁকি। লেখা শেষে উপরে একটা কভার পৃষ্ঠা যোগ করি। সে-পৃষ্ঠায় গল্পের একটা নাম দিই ও লিখি, নিজের নাম লিখি এবং ইচ্ছামতো ছবি আঁকি। এভাবে নিজের লেখা একটি গল্পের বই তৈরি করি।

ফুটবল খেলোয়াড়

জসীমউদ্দীন



আমাদের মেসে ইমদাদ হক ফুটবল খেলোয়াড়,
হাতে পায়ে মুখে শত আঘাতের ক্ষতে খ্যাতি লেখা তার।
সন্ধ্যাবেলায় দেখিবে তাহারে পটি বাঁধি পায়ে হাতে,
মালিশ মাখিছে প্রতি গিটে গিটে কাত হয়ে বিছানাতে।
মেসের চাকর হয় লবেজান সেঁক দিতে ভাঙ্গা হাড়ে,
সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।
আমরা তো ভাবি ছ মাসের তরে পঞ্জু সে হলো হায়,
ফুটবল-চিমে বল লয়ে কভু দেখিতে পাব না তায়।

প্রভাত বেশায় খবর লইতে ছুটে যাই তার ঘরে,
বিছানা তাহার শূন্য পড়িয়া ভাঙ্গা খাটিয়ার 'পরে।
টেবিলের পরে ছেট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,
উপহাস যেন করিতেছে মোরে ছিপি-পরা দাঁত তুলি।
সন্ধ্যাবেলায় খেলার মাঠেতে চেয়ে দেখি বিজয়ে,
মোদের মেসের ইমদাদ হক আগে ছুটে বল লয়ে।

বাম পায়ে বল ড্রিবলিং করে ডান পায়ে মারে ঠেলা,
ভাঙ্গা কয়খানা হাতে পায়ে তার বজ্জ করিছে খেলা।
চালাও চালাও আরো আগে যাও বাতাসের আগে ধাও,
মারো জোরে মারো-গোলের ভিতরে বলেরে ছুড়িয়া দাও।
গোল-গোল-গোল, চারদিক হতে ওঠে কোলাহলকল,
জীবনের পণ, মরণের পণ, সব বাধা পায়ে দল।
গোল-গোল-গোল—মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,
ভাঙ্গা দুটি পায়ে জয়ের ভাগ্য লুটিয়া আনিল আজি।
দর্শকদল ফিরিয়া চলেছে মহা-কলরব করে,
ইমদাদ হক খৌড়াতে খৌড়াতে আসে যে মেসের ঘরে।
মেসের চাকর হয়রান হয় পায়েতে মালিশ মাখি,
বেঘুম রাত্রি কেটে যায় তার চিত্কার করি ডাকি।
সকালে সকলে দৈনিক খুলি মহা-কলরবে পড়ে,
ইমদাদ হক কাল যা খেলেছে কমই তা নজরে পড়ে।

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূগভাব জেনে নিই।

জাত খেলোয়াড় ইমদাদ হক। খেলা এবং খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজের অবস্থা যেমনই হোক না কেন খেলা-পাগল সে, খেলবেই। খেলতে গিয়ে ইমদাদ কত শত আঘাত পায়। তবু সেসব কষ্টকে পরোয়া না করে সে খেলে এবং তার জন্যই খেলায় জিত আসে। তার জন্যই সকল দর্শক খেলার আনন্দ পায়। এই কবিতায় খেলাছলে একটি আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো, নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে মানুষ যদি একান্তভাবে কিছু করে, তবে অন্য সকলের জন্যও সে বড় কিছু করতে পারে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ক্ষত পটি মালিশ ড্রিবলিং বজ্র কোলাহলকল মহাকলরব

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বজ্র পটি মালিশের ক্ষত মহাকলরব

ক. ইমদাদ হকের শরীরে অনেক আঘাতের রয়েছে।

খ. সন্ধ্যাবেলায় পায়ে হাতে বাঁধে সে।

গ. খেলায় জিতে দর্শকেরা করে ফিরে যাচ্ছে।

ঘ. টেবিলের ওপর শিশিগুলো রাখা আছে।

ঙ. পড়ার শব্দে শিশুটির ঘুম ভেঙ্গে গেল।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও শিখি।

ক. প্রভাত বেলায় ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদ হকের বিছানা শূন্য পড়ে আছে কেন?

খ. টেবিলের ওপরে ছোট-বড় মালিশের শিশি কবিকে উপহাস করছে কেন?

গ. কবিতায় ইমদাদ হকের খেলা ও দর্শকের আনন্দপূর্ণ নানান অভিমতের বর্ণনা দাও।

৫. খালি জায়গায় কবিতার ঠিক লাইনটি লিখি।

ক.,

সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।

খ. টেবিলের পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,

.....।

গ. গোল-গোল-গোল— মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,

.....।

৬. ইমদাদ হক সম্রক্ষে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় খেলা নিয়ে একটি রচনা লিখি।

খ. ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার সাময়িক ছুটি চেয়ে সুপারিনটেনডেন্টের নিকট একটা আবেদনপত্র লিখি।

গ. নিচের ফরমটি খাতায়/কাগজে লিখে পূরণ করি।

আন্তঃ ইবতেদায়ি মাদরাসা ক্লীভা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা ফরম

১. শিক্ষার্থীর নাম :

২. মাদরাসার নাম :

৩. শ্রেণি :

৪. (ক) শিক্ষার্থীর পিতার নাম:

(খ) শিক্ষার্থীর মাতার নাম:

৫. বর্তমান ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং ডাকঘর/মহল্লা

উপজেলা জেলা

৬. স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং ডাকঘর/মহল্লা
উপজেলা জেলা.....

৭. জন্ম তারিখ

৮. যেসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক

ক.

খ.

গ.

শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর



কবি-পরিচিতি

কবি জসীমউদ্দীন ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মতারিখ ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি।

গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় পল্লিজীবন বেশি উঠে এসেছে বলে তিনি ‘পল্লিকবি’ নামে খ্যাত হয়েছেন। তবে জসীমউদ্দীন ছোটদের জন্যও অনেক সুন্দর কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনি ও আতজীবনী অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর কবিতা ‘কবর’, কাব্যগ্রন্থ ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ ও ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’, ছোটদের জন্য লেখা ‘ডালিম কুমার’, ‘হাসু’ ও ‘এক পয়সার বাঁশি’ বিখ্যাত। তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

জসীমউদ্দীন

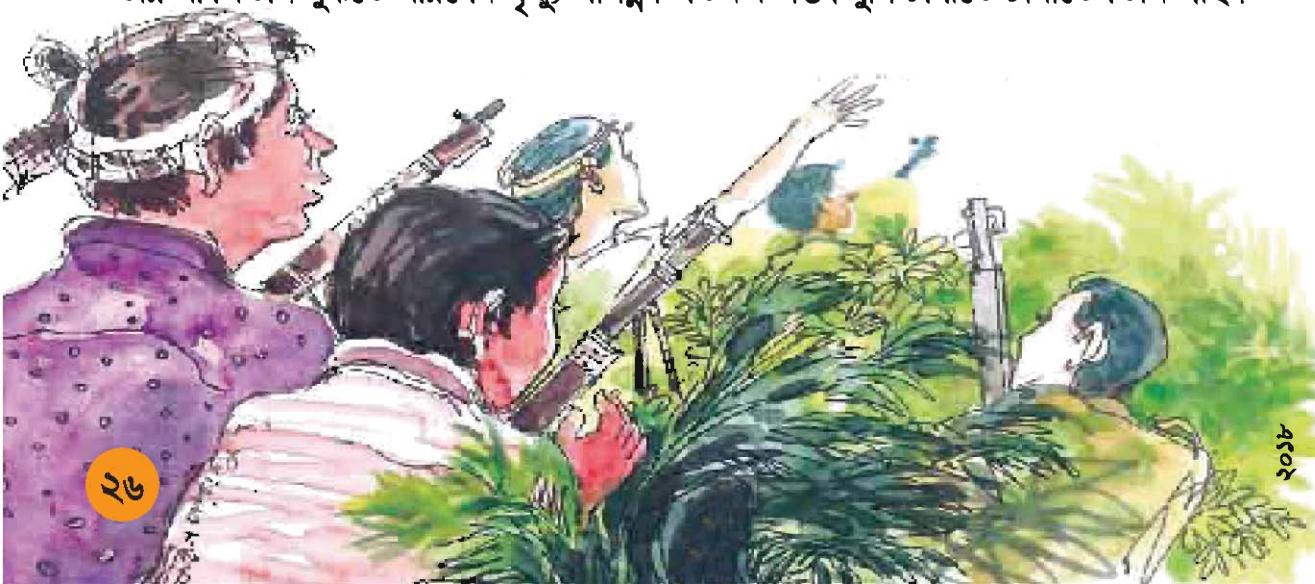
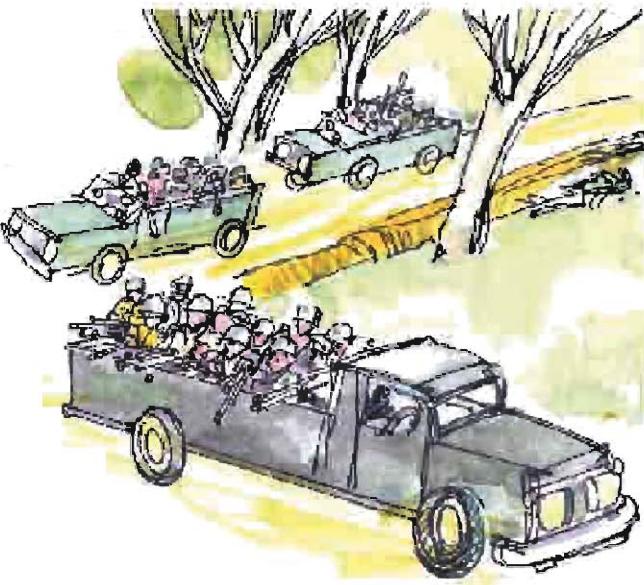
বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ

দুর্ভ এক কিশোর। নাম নূর মোহাম্মদ শেখ।
বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। নাটক, থিয়েটার
আর গানের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ। কিশোর
বয়সে হঠাতে করে তার বাবা-মা মারা গেলেন।
বদলে গেল তাঁর জীবন। যোগ দিলেন ইপিআর-এ
অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ।

সময়টা ১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর।

যশোরের পাকিস্তানি ছুটিপুর ক্যাম্প। একটু দূরে
গোয়ালহাটি গ্রামে টহল দিচ্ছিলেন পাঁচ মুক্তিযোদ্ধা। এন্দেরই নেতৃত্বে
ছিলেন ল্যাঙ্গনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ। পাকিস্তানি সেনারা টের পেয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধাদের
অবস্থান। রাজাকারদের সহায়তায় তিনি দিক থেকে পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের ঘিরে ফেলে।
কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা দমবার পাত্র নন। এই দলেই ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা নানু মিয়া।
কিন্তু প্রতিপক্ষের একটা গুলি হঠাতে এসে লাগে তাঁর গায়ে। নূর মোহাম্মদ তাঁকে এক হাত দিয়ে
কাঁধে তুলে নিলেন আর অন্য হাত দিয়ে গুলি চালাতে থাকলেন। কৌশল হিসেবে বারবার নিজের
অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকলেন তিনি। উদ্দেশ্য- একজন নন, অনেক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ
করছেন, শত্রুদের এ রকম একটা ধারণা দেওয়া। সংখ্যায় কম বলে সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন
পিছিয়ে গিয়ে অবস্থান নিতে।

কিন্তু হঠাতে মর্টারের একটা গোলা এসে লাগল তাঁর পায়ে। গোলার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল
তাঁর পা। তিনি বুঝতে পারলেন মৃত্যু আসন্ন। যতক্ষণ সম্ভব গুলি চালাতে চালাতে তিনি শহিদ



হলেন। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে নূর মোহাম্মদ শেখ
এভাবেই রক্ষা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন।
সাহসী এই বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার জন্ম ১৯৩৬ সালের
২৬শে ফেব্রুয়ারি নড়াইলের মহিষখোলা গ্রামে।

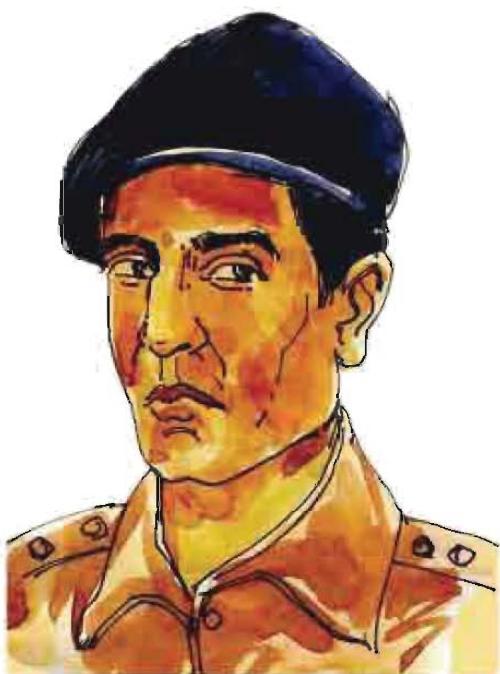
এ রকমই আরেক যোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ ল্যাঙ্কনায়েক মুসী আবদুর
রউফ। ১৯৪৩ সালের ৮ই মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী
থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায়
দারুণ দুরস্ত ছিলেন। তিনিও ইপিআর বাহিনীতে যোগ
দেন। মেশিন-চালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি
সৈনিকদের মতো মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।



বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

দিনটি ছিল একান্তরের ৮ই এপ্রিল। ঐদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি নৌসেনাদের উপর আক্রমণ
করবে। এজন্যে তাঁরা মহালছড়ির কাছে বুড়িঘাট এলাকার চিথড়ি খালের দুই পাশে অবস্থান গ্রহণ
করেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। সাথে নিয়ে আসে
সাতটি স্পিডবোট আর দুটি মোটর লঞ্চ। স্বল্পসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু ছিল অবধারিত। তবু

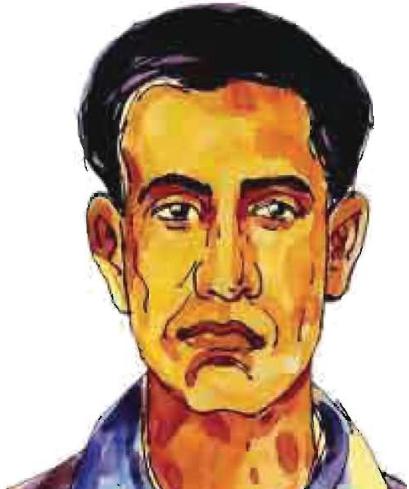
মুক্তিযোদ্ধারা পালিয়ে যাননি। আবদুর রউফ নিজেই
দায়িত্ব নিলেন নিজের জীবন দিয়ে সবাইকে রক্ষা
করার। হালকা একটা মেশিনগান হাতে তুলে নিয়ে
গুলি ছুঁড়ে শত্রুদের রুখে দিতে থাকলেন। সহযোদ্ধাদের
বললেন নিরাপদে সরে যেতে। মুক্তিযোদ্ধাদের
আক্রমণে পাকিস্তানিদের সাতটি স্পিডবোটই ভুবে
গেল। বাকি লঞ্চ দুটো থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা
পিছু হটতে থাকল। এ রকম মুহূর্তেই হঠাৎ একটা গোলা
এসে পড়ল তাঁর উপর, তিনি শহিদ হলেন। বীরের
রক্তস্তোত্রে রঞ্জিত হলো মাটি। রাঙামাটি জেলার বোর্ড
বাজারের কাছে নানিয়ারচরের চিথড়ি খালের কাছাকাছি
একটি টিলার উপর সমাহিত হন বীরশ্রেষ্ঠ মুসী আবদুর
রউফ। পরবর্তী সময়ে সমাধিকে স্থিতিস্থলে রূপান্তরিত
করে সরকার।



বীরশ্রেষ্ঠ মুসী আবদুর রউফ

একান্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কতভাবেই না যুদ্ধ করতে হয়েছিল আমাদের। এই যুদ্ধে জয়ী বাহিনী হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা বয়ে এনেছেন অসীম গৌরব। এ রকমই এক যুদ্ধে শহিদ হন বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রান্তে আমরা। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌজাহাজ বিএনএস পলাশ এবং বিএনএস পদ্মা মৎসা কন্দর দখল করে নিয়েছে। এবার খুলনা দখলহই লক্ষ্য। তৈরব নদী বেয়ে খুলনার দিকে ধেয়ে আসছেন তাঁরা।



বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন

জাহাজ দুটি খুলনার কাছাকাছি চলে আসে। এমন সময় একটা বোমারু বিমান থেকে জাহাজ দুটির ওপর বোমা এসে পড়ে। রুহুল আমিন বিএনএস পলাশের ইঞ্জিনরুমে ছিলেন। ইঞ্জিনরুমের ওপরে বোমা পড়েছিল। ইঞ্জিন বিকল হয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল পলাশে। তাঁর ডান হাতটি উড়ে গিয়েছিল। তিনি আহত অবস্থায় ঝাঁপ দিয়ে নদী সাঁতরে পাড়ে উঠলেন। বোমার আঘাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন। কিন্তু রাজাকারদের হাতে নির্মমভাবে মৃত্যু হলো তাঁর। তিনি শহিদ হলেন। খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ মুক্ত। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি। দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গবিত আমরা।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

টহল আসন্ন অবধারিত রক্তস্নেতে রঞ্জিত শায়িত

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নূর মোহাম্মদ শেখ	নানু মিয়া	শিপইয়ার্ডের	১৯৪৩ সালের ৮ই মে	রুহুল আমিন
------------------	------------	--------------	------------------	------------

ক. ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখের দলে ছিলেন অসীম সাহসী

মুক্তিযোদ্ধা।

- খ. নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সেদিন এভাবেই রক্ষা
করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন।
- গ. ল্যাঙ্গনায়েক মুঢ়ী আবদুর রউফ সালের মে ফরিদপুর
জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ঘ. খুলনা কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীরশ্রেষ্ঠ
..... ।

৩. প্রশংসনোর উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়ে
ছিলেন ?
- খ. ল্যাঙ্গনায়েক মুঢ়ী আবদুর রাউফের যুদ্ধের ঘটনাটা লিখি।
- গ. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন ?
- ঘ. গল্প থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বীরযোদ্ধাদের সমর্কে যা জেনেছি তা নিজের ভাষায় লিখি।

৪. ব্যাখ্যা করি।

দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত আমরা।

৫. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

দুরন্ত	শান্ত	শান্ত ছেলেটি শুধু পড়তে ভালোবাসে।
অসীম
সুনাম
বীর
জয়
জীবন

৬. ঠিক উত্তরটিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বাবা মারা যাওয়ার পর নূর মোহাম্মদ কিসে যোগ দিলেন?

- ১. বাংলাদেশ রাইফেলসে
- ২. ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে
- ৩. বাংলাদেশ নেতৃত্বে
- ৪. কোনোটিই না

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ শেখ এর জন্ম-

- ১. ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি
- ২. ১৯৩৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি
- ৩. ১৯৩৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি
- ৪. ১৯৩৭ সালের ২৬শে জানুয়ারি

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের কয়টি স্পিডবোট ডুবে গিয়েছিল?

- ১. পাঁচটি
- ২. আটটি
- ৩. সাতটি
- ৪. নয়টি

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ মুঢ়ী আবদুর রউফকে সমাহিত করা হয়-

- ১. বোয়ালমারির সালামতপুর
- ২. বক্সিবাজার
- ৩. নানিয়ারচরের চিংড়িখাল
- ৪. বুড়িঘাট

ঙ. খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা-

- ১. নূর মোহাম্মদ শেখ
- ২. মুঢ়ী আবদুর রউফ
- ৩. মোস্তফা কামাল
- ৪. মোহাম্মদ রুহুল আমিন

৭. আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে তারিখবাচক শব্দ শিখি।

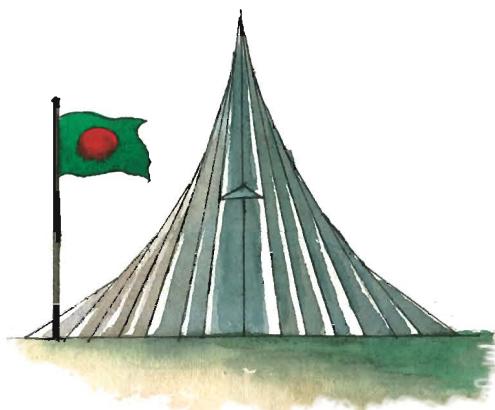
ক. শহিদ দিবস-

খ. স্বাধীনতা দিবস-

গ. বাংলা নববর্ষ-

ঘ. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস-

ঙ. বিজয় দিবস-





ফেব্রুয়ারির গান

শুভকর রহমান রিটন

দোয়েল কোয়েল ময়না কোকিল
সবার আছে গান
পাখির গানে পাখির সুরে
মুগ্ধ সবার প্রাণ।

সাগর নদীর উর্মিমালার
মন ভোলানো সুর
নদী হচ্ছে দ্রোতম্বিনী
সাগর সমুদ্দুর।

ছড়ায় পাহাড় সুরের বাহার
ঝরনা-প্রকৃতিতে
বাতাসে তার প্রতিধ্বনি
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে।



গাছের গানে মুগ্ধ পাতা
মুগ্ধ স্বর্ণলতা
হৃদ-সুরে ফুলের সাথে
প্রজাপতির কথা।

ফুল পাখি নই, নইকো পাহাড়
ঝরনা সাগর নই
মায়ের মুখের মধ্যে ভাষায়
মনের কথা কই।

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
শহিদ ছেলের দান
আমার ভাইয়ের রক্তে লেখা
ফেব্রুয়ারির গান।

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে একটি অরণীয় দিন। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজ এই দিনে আন্দোলন শুরু করেন। ছাত্রদের মিছিলে পাকিস্তানি সরকার গুলি চালায়। সালাম, বরকত, শফিক, জব্বার ও আরও অনেকে (যাদের নাম জানা যায়নি) শহিদ হন। ঐ ঘটনা অবলম্বন করে কবি লুৎফুর রহমান রিটন ‘ফেব্রুয়ারির গান’ কবিতাটি লিখেছেন। বাংলা ভাষার প্রতি মমতা আর শহিদদের প্রতি শুন্ধা প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

মুগ্ধ উর্মি উর্মিমালা স্নোতস্বিনী সমুদ্র বাহার স্বর্ণলতা প্রতিধ্বনি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সমুদ্র মুগ্ধ বাহার প্রতিধ্বনি মন ভোলানো স্নোতস্বিনীতে

ক. বাংলার সৌন্দর্য দেখে আমি।

খ. গ্রীষ্মকালে ফলের দেখা যায়।

গ. সাত তের নদী পার হওয়া চাতিখানি ব্যাপার না।

ঘ. ভেসে চলেছে পাল তোলা নৌকা।

ঙ. রংধনুর রং এ আকাশ রঙিন হয়েছে।

চ. সকল মানুষের কঢ়ে একই।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

ক. কবি এই কবিতায় কত ধরনের সুরের কথা বলেছেন?

খ. পাতা আর স্বর্ণলতা কিসে মুগ্ধ হচ্ছে?

গ. প্রজাপতি ফুলের সাথে কীভাবে কথা বলে?

ঘ. আমরা কোন ভাষাতে আমাদের মনের কথা বলি?

ঙ. ‘শহিদ ছেলের দান’ হিসেবে আমরা কী পেয়েছি?



৫. ঠিক উন্নতিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মনের কথা কীভাবে বলব?

- | | |
|------------------|-----------------|
| ১. মায়ের ভাষায় | ২. বাবার ভাষায় |
| ৩. দাদার ভাষায় | ৪. মামার ভাষায় |

খ. পাখির গানে সবার প্রাণ কেমন হয়?

- | | |
|-----------|---------|
| ১. বিরক্ত | ২. মুখ |
| ৩. রাগ | ৪. খুশি |

গ. নদীর অপর নাম কী?

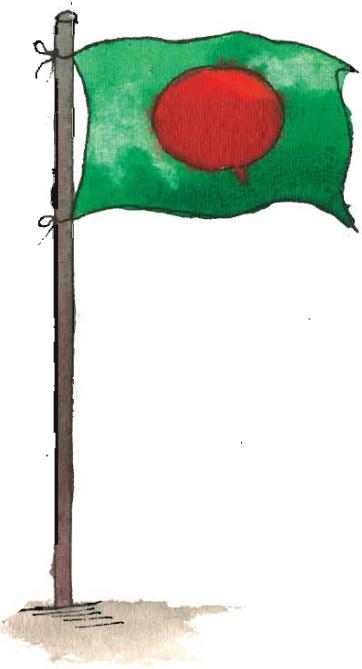
- | | |
|----------------|----------|
| ১. স্নোতস্বিনী | ২. পুকুর |
| ৩. সমুদ্র | ৪. খাল |

ঘ. ফুলের সাথে কে কথা বলে?

- | | |
|-------------|---------|
| ১. প্রজাপতি | ২. হরিণ |
| ৩. মানুষ | ৪. পাখি |

ঙ. ফেব্রুয়ারির গান কাদের রক্তে লেখা?

- | | |
|------------|------------|
| ১. ভাইয়ের | ২. মামার |
| ৩. বাবার | ৪. মানুষের |



৬. কর্ম-অনুশীলন

একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।



শুফর রহমান
রিটন

কবি-পরিচিতি

শুফর রহমান রিটন ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্র বিষয়ে ছড়া ও কবিতা রচনা করে তরুণ বয়সেই তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ছড়া ছাড়াও তিনি গল্প উপন্যাস লেখেন। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৭ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান। টেলিভিশনের উপস্থাপক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থ : ‘ধূমুরি’, ‘ঢাকা আমার ঢাকা’, ‘ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ’, ‘ভূতের বিয়ের নিমন্ত্রণে’, ‘বাচ্চা হাতির কাউকারখানা’ ইত্যাদি।

শথের মৃৎশিল্প

গ্রামের নাম আনন্দপুর। মামার বাড়ি। কথায় আছে, মামার বাড়ি রসের ইঁড়ি। আসলেই তাই। পড়া নেই, বাধা নেই, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও, যা খুশি খাও। এই তো মামার বাড়ি। গেল বছর পহেলা বৈশাখের ছুটিতে গিয়েছিলাম আনন্দপুর। সেখানে পহেলা বৈশাখে মেলা বসে। মামা বললেন, তোমাদের মেলা দেখাতে নিয়ে যাব।



শথের ইঁড়ি

আমরা ছিলাম চারজন—আমি, মামাতো বোন বৃষ্টি, সোহানা আর ছোট ভাই তাজিন। মেলা বসে সকালে। আমরা একটু দেরি করেই গেলাম। মামা বেশ মজার মানুষ। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। তাতে থাকে ছবি আঁকার জিনিস, থাকে একটা বাঁশি। পড়েন ঢাকার চারুকলা ইনসিটিউটে। মেলার একটু কাছে পৌছতেই শুনতে পেলাম নাগরদোলার কঁচর কঁচর শব্দ। দেখলাম বাঁশের তৈরি কুলো, ডালা, ঝূড়ি, চালুন, মাছ ধরার চাঁই, খালুই। আরও কত কী! বসেছে বাঙ্গি, তরমুজ, মুড়ি-মুড়িকি, জিলাপি আর বাতাসার দোকান সারি সারি। আরেকটু এগোতেই দেখতে পেলাম কত রঙের, কত বর্ণের বিচিত্র সব মাটির ইঁড়ি। ফুল, পাতা, মাছের ছবি আঁকা সেসবে। রয়েছে মাটির ঘোড়া, হাতি, ধাঁড় আর নানা আকারের মাটির পুতুল। আমার চোখ পড়ল কাজ করা অপূর্ব সুন্দর মাটির ইঁড়ির দিকে। মামাকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কিসের ইঁড়ি?

মামা বললেন, এটা শখের হাঁড়ি। শখ করে পছন্দের জিনিস এই সুন্দর হাঁড়িতে রাখা হয়। তাই এর নাম শখের হাঁড়ি। তাছাড়া শখের যেকোনো জিনিসই তো সুন্দর।

আমরা দুটি শখের হাঁড়ি কিনলাম। অবাক হলাম, পুতুলের পাশেই ঘোলা চোখে চেয়ে আছে এক চকচকে রূপালি ইলিশ। পদ্মার তাজা ইলিশের মতোই। তেমনি সাদা আঁশ, লাল ঠোঁট। আমরা একটা মাটির ইলিশও কিনলাম। মামা বললেন, ওই যে পুতুলগুলো দেখছ ওগুলো টেপা পুতুল। নরম এঁটেল মাটি টিপে টিপে এসব পুতুল বানানো হয়। যেমন- বউ জামাই, কৃষক, নথপরা ছেউ মেয়ে-নানা রকমের মাটির টেপা পুতুল। মেলার এক প্রান্তে বড় জায়গা জুড়ে এসব মাটির পুতুলের দোকান। মামা বললেন, এগুলো হচ্ছে মাটির শিল্পকলা। মামা বুবিয়ে বললেন- যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমার সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছেন মাটির জিনিস।

যেমন- কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসনকোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ। আরও কত কী!

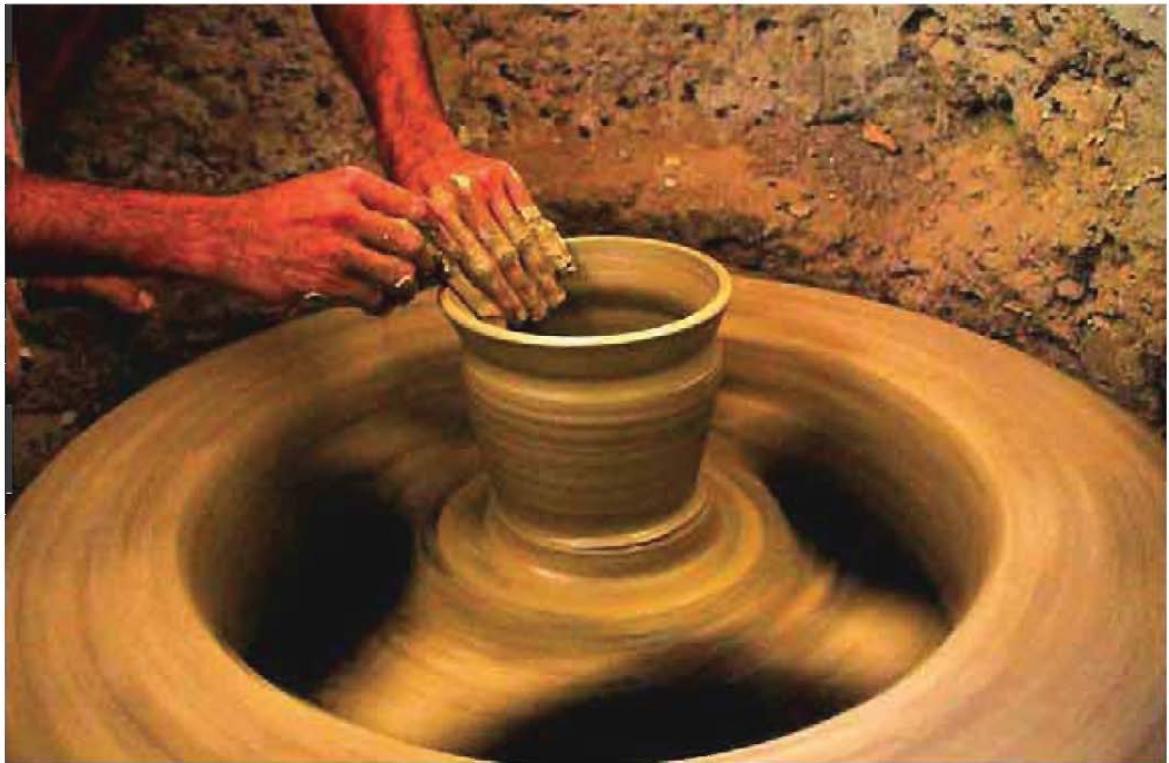
মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। তবে সব মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না। দরকার পরিষ্কার এঁটেল মাটি। এ ধরনের মাটি বেশ আঠালো। দোআঁশ মাটি তেমন আঠালো নয়। আর বেলে মাটি তো বরবরে - তাই এগুলো দিয়ে মাটির শিল্প হয় না। এঁটেল মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এজন্য অনেক যত্ন আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমারদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তাঁরা বশ্য পরম্পরায় এ কাজ করে আসছেন।



টেপা পুতুল



টেপা পুতুল



কাঠের চাকায় মাটির পাত্র তৈরি হচ্ছে

আবার এ কাজের জন্য প্রয়োজন কিছু ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম। সবকিছুর আগে যেটা দরকার তা হলো একটা কাঠের চাকা। এই চাকায় নরম মাটির তাল লাগিয়ে নেন কুমাররা। তারপর চাকাটি জোরে ঘোরান। আর হাত দিয়ে মাটির তাল ধরেন। এভাবে নানা আকারের মাটির পাত্র ও নানা জিনিস তৈরি করেন কুমাররা।

মেলা থেকে সেদিন আমরা অনেক টেপা পুতুল, ঘোড়া, হাতি, ছোট কলস কিনলাম। মামা বললেন, এত সুন্দর নকশা দেখছ, রং দেখছ- এ সবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি। নকশাগুলো তাঁরা মন থেকে আঁকেন। আর রং তৈরি করেন শিম, সেগুন পাতার রস, কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে। তবে আজকাল বাজার থেকে কেনা রংও লাগানো হয়। মেলা থেকে কদম্ব, বাতাসা, মুড়কি ও কৈ কিনে শখের ইঁড়ি ভর্তি করে আমরা ফিরলাম। খুব মজা হলো।

মামা বললেন, তোমাদের কাল কুমারপাড়ায় নিয়ে যাব। পরদিন আমরা দেখতে গেলাম কুমারপাড়া। আনন্দপুর গ্রামের উন্নত দিকে আট-দশ ঘর বসতবাড়ি। এই নিয়ে কুমারপাড়া। এখানে সবাই ব্যস্ত। কেউ মাটির তাল চাক করে সাজিয়ে রাখছেন। কেউ-বা কাঠের চাকায় মাটি লাগিয়ে নানা আকারের পাত্র বানাচ্ছেন। কেউ-বা এগুলো সারি সারি করে শুকোতে দিচ্ছেন রোদে। পাশেই রয়েছে মাটির জিনিস পোড়ানোর চুলা। উচু ছেউ টিবির মতো এই চুলা। মাটির পোড়া গন্ধ

পাছি। আর ধোঁয়া বেরোছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ করছে। মামা বললেন, হাঁড়ি
কলসি ছাড়াও আমাদের দেশে এক সময় সুন্দর পোড়ামাটির ফলকের কাজ হতো। এর অন্য
নাম টেরাকোটা। বাংলার অনেক পুরানো শিল্প এই টেরাকোটা। নকশা করা মাটির ফলক ইটের
মতো পুড়িয়ে তৈরি করা হতো এই টেরাকোটা। শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধ
বিহার ও দিনাজপুরের কাঞ্চজির মন্দিরে এই টেরাকোটার কাজ রয়েছে। মাটির ফলকে ছবি একে
শুকিয়ে পোড়ানোর পর এগুলো এমন সুন্দর হয়ে ওঠে! ছোট ছোট ফলককে পাশাপাশি জোড়া
দিয়ে বড় করা যায়। পোড়ামাটির এই ফলক বাংলার প্রাচীন মৃৎশিল্প। মামা বললেন, টেরাকোটা
বা পোড়ামাটির এসব কাজ এ দেশে শুরু হয়েছে হাজার বছর আগে।

আজকাল কি পোড়ামাটির এই শিল্পচর্চা হয় না? মামার কাছে জানতে চাইলাম আমরা। মামা
বললেন, আজকাল ওরকম টেরাকোটা হচ্ছে না বটে, তবে পোড়ামাটির নকশার কদর বেড়েছে।
সরকারি-বেসরকারি ভবনে আজকাল সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নানা রকম নকশা করা মাটির
ফলক ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশের কুমাররা এসব তৈরি করছেন। বললাম, আমরা এসব
পোড়ামাটির কাজ দেখতে চাই।

মামা বললেন, সুযোগমতো এক সময় তোমাদের শালবন বিহারে নিয়ে যাব।

-সংগৃহীত

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

শখ টেপা পুতুল নকশা শালবন বিহার টেরাকোটা মৃৎশিল্প শখের হাঁড়ি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

শখ নকশা মৃৎশিল্প টেপা পুতুল

ক. এই যে দেখছ, এসবই গ্রামের শিল্পীদের তৈরি।

খ. মাটির পুতুল জমানো আমার একটি।

গ. মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে বলে।

ঝ. আমরা মেলা থেকে অনেক কিনলাম।

৩. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) টিক দিই।

ক. আনন্দপুরে কখন মেলা বসে?

- | | |
|----------------------|------------------|
| ১. মোলই ডিসেম্বর | ২. পহেলা বৈশাখ |
| ৩. একুশে ফেব্রুয়ারি | ৪. পহেলা ফাল্গুন |

খ. মামা কোথায় পড়েন?

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ১. ঢাকা কলেজে | ২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে |
| ৩. ঢাকার চারুকলা ইনসিটিউটে | ৪. চট্টগ্রামের চারুকলা ইনসিটিউটে |

গ. মৃৎশিল্পের সবচেয়ে প্রাচীন উপাদান হচ্ছে -

- | | |
|---------|---------|
| ১. বাঁশ | ২. কাঠ |
| ৩. পানি | ৪. মাটি |

ঘ. আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে -

- | | |
|--------------|--------------|
| ১. চারুশিল্প | ২. মৃৎশিল্প |
| ৩. কারুশিল্প | ৪. দারুশিল্প |

ঙ. কুমার সম্মদায় কিসের কাজ করেন -

- | | |
|--------------------|--------------|
| ১. বাঁশের কাজ | ২. কাঠের কাজ |
| ৩. পাকা বাঢ়ির কাজ | ৪. মাটির কাজ |

চ. গ্রামের শিল্পীরা রং তৈরি করেন-

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| ১. আম ও লাট পাতা থেকে | ২. শিম ও কাঁঠাল গাছের বাকল থেকে |
| ৩. সরিষা ফুল থেকে | ৪. পান ও চুন থেকে |

ছ. পোড়া মাটির ফলকের অন্য নাম-

- | | |
|----------------|-------------|
| ১. টেপা পুতুল | ২. টেরাকোটা |
| ৩. শখের হাঁড়ি | ৪. মৃৎশিল্প |

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. মাটির শিল্প বলতে কী বুঝি?

খ. বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম কোনটি?

গ. শখের ইঁড়ি কী রকম?

ঘ. বৈশাখী মেলায় কী কী পাওয়া যায়?

ঙ. মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান কী?

চ. কয়েকটি মৃৎশিল্পের নাম বলি।

ছ. টেরাকোটা কী?

জ. বাংলাদেশের কোথায় পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প দেখতে পাওয়া যায়?

ঝ. মাটির শিল্প কেন আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়?

ঝঃ. মামার বাড়ি রসের ইঁড়ি – প্রচলিত এই কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়?

৫. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানাই অথবা গাই, তখন তা হয় শিল্প। শিল্পের এ কাজকে বলে শিল্পকলা। আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প। এ দেশের কুমার সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছেন মাটির জিনিস, যেমন—কলস, ইঁড়ি, সরা, বাসনকোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ। আরও কত কী! মাটির তৈরি শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। মাটি হলেই যে তা দিয়ে শিল্পের কাজ করা যাবে তাও নয়। এজন্য অনেক যত্ন আর শ্রম দরকার। দরকার হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান। কুমারদের কাছে এসব খুব সহজ। কারণ তাঁরা বৎশ পরম্পরায় এ কাজ করে আসছেন।

ক. শিল্পকলা বলতে কী বোঝা?

খ. শিল্পের কাজের জন্য কী কী প্রয়োজন?

গ. কেন কুমারদের কাছে এসব কাজ সহজ?

৬. নিচের শব্দগুলো দিয়ে যা বুঝি তা লিখি।

ক. মৃৎশিল্প

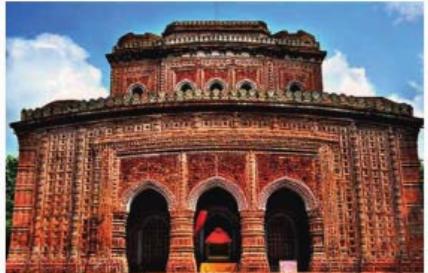
গ. টেরাকোটা

খ. শখের ইঁড়ি

ঘ. টেপা পুতুল

৭. নিচের কথাগুলো বুবে নিই।

কান্তজির মন্দির ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা রামনাথ রায় দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরের গায়ে স্থাপিত অপূর্ব সুন্দর টেরাকোটা বাহ্যার মাটির শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন।



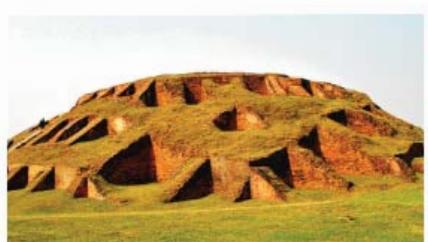
পাহাড়পুর

নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন সোমপুর বিহার। এই সোমপুর বিহারের আশ-পাশের বড় বৌদ্ধ মন্দিরে পাওয়া গেছে অনেক সুন্দর টেরাকোটা। এগুলো অষ্টম শতকের অর্ধাং আজ থেকে প্রায় বারো শ বছর আগের তৈরি।



শালবন বিহার

কুমিল্লার ময়নামতিতে মাটি খুড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। অষ্টম শতকের এই পুরাকীর্তি বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক। শালবন বিহারে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির ফলক।



মহাস্থানগড়

বগুড়া শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থানগড়। যিশু খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে তৃতীয় থেকে প্রথম পনেরো শতকে বাংলার এ প্রাচীন নগর গড়ে উঠে। মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে অনেক পোড়ামাটির ফলক, পাত্র, অলংকার ও মূর্তি।



৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমার দেখা কুমারপাড়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিই।

অথবা

আমার দেখা কোনো হস্তশিল্প বা হাতের কাজ সম্পর্কে লিখি।

শক্তিশালী

সুস্থান বন্ধুরা

পুরু ভাকে ইস ভাকে-ভাকে কল্পনা
গাছে ভাকে শৃঙ্খল পাবি সানা দিনভোর।
মোরগোলৰ ভাক খুনি প্রতিদিন জোর
নিশিয়াতে কূকূজোর দল ভাকে জোর।
মোরেল চমুই মিলে কিটিৰ মিটিৰ
পান খুনি সুস্থ আৱ চুনচুনিদিৰ।



শহরের পাড়ি কাকে ভাকে বৌকে
চুম দেমা মুণ্ডিল হৰ্ষের ঝাকে।
শিতি চলে, চিতি চলে, বালে টেলিবোম
দ্বৰায় বেল বালে, কাম পেতে শোম।
গলিগৰে ফেরিয়ালা ঝাকে আৱ ঝাটে
হোটেলের হাইচাই ইশকূল মাঠে।

গান্ধি সেই সুজে তজে বাবু মন
শহুজে জীবন জালা—শহসুরণ।



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নিশ্চিন্তা কিছির মিচির ফেরিঅলা শব্দদূষণ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফেরিঅলা নিশ্চিন্তা শব্দদূষণ কিছির মিচির

ক. চেঁচামেটি করো না, সবাই ঘুমুচ্ছে।

খ. ভোর বেলাতেই পাখির শুনতে শুনতে আমার ঘুম ভাঙে।

গ. ইঁক দিচ্ছে—থালাবাসন চাই?

ঘ. আমাদের শোনার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবিতায় কোন কোন পশু ও পাখির কথা বলা হয়েছে?

খ. শহরে কী কারণে শব্দদূষণ হয়?

গ. কুকুরের ডাক আর পাখির ডাকের মধ্যে কোনটি তোমার ভালো লাগে? কেন?

ঘ. গ্রামের মানুষ কোন পাখির ডাক শুনে ঘুম থেকে ওঠেন?

৪. শহুরে জীবনের সাথে গ্রামের জীবনের তুলনা করি ও লিখি।

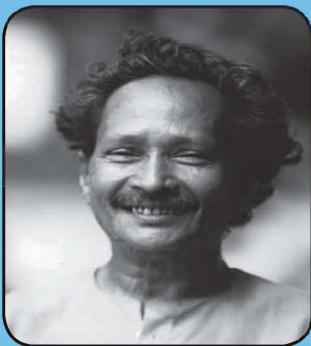
বিষয়বস্তু	শহুরে জীবন	গ্রামের জীবন
পরিবেশ		
শব্দ		
রাস্তাধাট		
জীবনযাত্রা		
হাটবাজার		

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

পাল্লির সেই সুরে ভরে যায় মন
শহুরে জীবন জ্বালা-শব্দদূষণ।

শহরে শান্তিতে বসবাস করা মুশকিল। কারণ হাজার
রকমের শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়। গ্রামে শব্দ
অনেক কম, তার ফলে মনের শান্তি বজায় থাকে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।



কবি-পরিচিতি

সুকুমার বড়ুয়া বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ছড়াকার। তিনি ১৯৩৮ সালের ৫ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের রাউজান থানার বিনাজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ : পাগলা ঘোড়া, ভিজে বেড়াল, চন্দনা রঞ্জনার ছড়া, এলোপাতাড়ি, নানা রঙের দিন, চিচিংফাঁক প্রভৃতি। তিনি শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছেন।

সুকুমার বড়ুয়া

স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন আমরা দেশকে পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করে বিজয় অর্জন করি। এই বিজয়কে পাওয়ার আগে দেশবাসীকে করতে হয় এক মরণপণ মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন পাকিস্তানি শত্রুসেনাদের বিরুদ্ধে। দেশের অন্য সব সাধারণ মানুষ তাঁদের জুগিয়েছেন ভরসা ও সাহস। অপেক্ষা করেছেন শত্রুর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার। সশন্ম যুদ্ধে আমাদের মুক্তিসেনারা প্রাণ দেন। আর দেশের ভিতরে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁরা ছিলেন নানা পেশার— কেউ ছাত্র, কেউ কৃষক, কেউ মজুর, কেউ পুলিশ, কেউ সৈনিক। আরও ছিলেন শিক্ষক, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা ও নানা পেশার লোক। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশুর রক্তে ভেজা আমাদের স্বাধীনতা। তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা আজ মুক্ত স্বাধীন দেশে উন্নত শিরে জীবনযাপন করতে পারছি। আমরা কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে। সেই অসংখ্য মহান আত্মানকারীদের কয়েকজনের কথা আমরা জেনে নিব।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরন্ত, ঘূমন্ত মানুষের ওপর। আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে, আর নানা আবাসিক এলাকায়। নির্বিচারে হত্যা করে ঘূমন্ত মানুষকে। সেই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে বিরামহীন। চালিয়ে যেতে থাকে পরবর্তী নয় মাস ধরে। পাশাপাশি তারা বিশেষ রকমের হত্যাকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনাও করে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের। পুরো দেশের নানা পেশার মেধাবী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে তারা।



গোপিনাথ দেব



সেলিনা পারভীন



মিয়াসউদ্দিন আহমদ

হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য পাকিস্তানিরা গড়ে তোলে রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনী। পাকিস্তানিরা গড়ে তোলে রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনী। পাকিস্তানিরা গড়ে তোলে রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনী।



রঘুবিজ্ঞান সাহা



মুনীর চৌধুরী



রশেদুল হাসান

পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্বী শিক্ষক এম. মুনিরুজ্জামান, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহষ্ঠাকুরতা, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতেই শুধু আক্রমণ চালায়নি, হানা দেয় তারা শিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতেও। বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম. মুনিরুজ্জামান। প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করেন। এই কুরআন পাঠরত মানুষটিকেই টেনে হিঁচড়ে নিচে নামায পাকিস্তানি সেনারা। একই বাড়ির নিচতলায় থাকতেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহষ্ঠাকুরতা। ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান শিক্ষক। তাঁকেও শত্রুসেনারা টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে। তারপর এই দুই শিক্ষককেই পুলি করে হত্যা করে। এ বাড়ির খুব কাছেই এক বাসায় থাকতেন অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব। দর্শনশাস্ত্রের যশস্বী শিক্ষক ছিলেন তিনি। মানুষ হিসেবে ছিলেন খুব সহজ সরল আর নিরহৎকার। ওই একই রাতে তাঁকেও হত্যা করে তারা। হত্যা করে আরও কয়েকজন শিক্ষককে।

পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রান্ত হয় সৎবাদপত্র অফিসগুলোও। প্রধান সৎবাদপত্রগুলোর অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা সেই রাতে। হত্যা করে বহু সাংবাদিককে। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা দৈনিক ‘সৎবাদ’ অফিসে আগুন দেয়। লেখক ও সাংবাদিক শহিদ সাবের সে রাতে ঐ অফিসেই ঘূমাছিলেন। ঘূমন্ত অবস্থায় সৎবাদ অফিসে পুড়ে মারা যান তিনি। শহিদ হন সেলিনা পারভীন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রাণ দেন কবি-সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা।

তারা হত্যা করে প্রথ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ধীরেণ্দ্রনাথ দত্তকে। তখন ঠাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন। কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে শত্রুসেনারা ঠাঁকে হত্যা করে। অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, দেশবাসীর স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আয়ুর্বেদীয় একটি প্রতিষ্ঠান সাধনা উষ্ণধালয়। ৮৪ বছর বয়স্ক এই মানুষটিও রেহাই পাননি পাকিস্তানি শত্রুদের হাত থেকে। ঠাঁকেও হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা।

এ দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন রংগদাপ্রসাদ সাহা। দানশীলতার জন্য লোকে ঠাঁকে ডাকত ‘দানবীর’ বলে। হত্যা করা হয় ঠাঁকে। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সমাজসেবক ছিলেন নৃতনচন্দ্র সিংহ। শত্রুসেনারা ঠাঁকেও রেহাই দেয়নি।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের ঝরণ করে আমরা ফুল দিতে যাই শহিদ মিনারে। তখন আমাদের মনে আর মুখে বেজে ওঠে একটি গান- ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’। এ গানে সুর দেন আলতাফ মাহমুদ। প্রতিভাবান এই সুরসাধকের প্রাণ কেড়ে নেয় পাকিস্তানি বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় অবধারিত। তখন তারা এদেশকে আরও গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। তারা জানে এদেশের মনস্বী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। পাকিস্তানিরা আমাদের সেই অপূরণীয় ক্ষতি করার কাজ শুরু করে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সহায়তায় নতুন করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। বিভিন্ন আবাসস্থল থেকে তারা ধরে নিয়ে যায় দেশের শক্তিমান, যশস্বী ও প্রতিভাবানদের। তারা ধরে নিয়ে যায় অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও অধ্যাপক আনোয়ার পাশাকে। ঠাঁরা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তুলে নিয়ে যায় ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদকে। ইংরেজির অধ্যাপক রাশীদুল হাসানও বাদ পড়েন না।

শত্রুরা তুলে নিয়ে যায় প্রথ্যাত শেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সারকে। সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, নিজাম উদ্দীন আহমদ ও আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা, প্রথ্যাত চিকিৎসক ফজলে রাবী, আবদুল আলীম চৌধুরী, মোহাম্মদ মোর্তজাকেও একইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আরও বহু জনকে। এরা কেউই আর জীবিত ফিরে আসেননি।

দেশ স্বাধীন হবার পরে এ সকল বুদ্ধিজীবীর অনেকের ক্ষত-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে। আবার অনেকের কোনো সন্ধানও পাওয়া যায়নি।



শহীদুল্লাহ কায়সার



আমনুল্লাহ পাশা



ফজলুল হক রাবী

তাঁদের স্মরণে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা পালন করি ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’। এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তাঁরা। তাঁদের প্রাণদান আমরা কখনো ব্যর্থ হতে দেব না। আমরা তাঁদের স্মরণ করব চিরদিন। দেশ ও মাতৃভাষার জন্য ত্যাগের মহান আদর্শ তাঁরা স্থাপন করে গেছেন। আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের যোগ্য মানুষ রূপে গড়ে তুলব। তবেই তাঁদের ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অবরুদ্ধ অবধারিত আত্মানকারী নির্বিচারে বরেণ্য পার্ক মনষী যশোৱী

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অবরুদ্ধ	অবধারিত	আত্মানকারী	বরেণ্য	নির্বিচারে	যশোৱী	পার্ক	মনষী
---------	---------	------------	--------	------------	-------	-------	------

ক. তারা বুঝতে পারে যে, তাঁদের পরাজয়।

খ. দেশের ভিতরে জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন
এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ।

গ. পাকিস্তানিরা একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও
মানুষদের।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে শহিদরা মহান হিসাবে চিরস্মরণীয়।

ঙ. পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে নিন্দিত মানুষকে।

চ. অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক।

ছ. কিছু লোকজন যোগ দেয় ওইসব বাহিনীতে।

জ. রাজাকার বাহিনী এদেশের অনেক চিন্তাবিদদের হত্যা করে।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?

খ. রাজাকার আলবদর কারা? তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলি ও লিখি।

গ. কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি
জানান? তাঁর সম্পর্কে বলি ও লিখি।

ঘ. শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

ঙ. রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়?

চ. দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি ও তাঁরা কোথায় কীভাবে শহিদ হন সে সম্পর্কে
লিখি।

ছ. আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?

জ. কোন দিনটিকে ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়? কেন?

ঝ. আমরা কীভাবে শহিদদের ঝণ শোধ করতে পারি?

৪. বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

বরণ করার যোগ্য

মেধাবী

মেধা আছে এমন যে জন

নিরহংকার

অহংকার নেই যার

বরেণ্য

বিচার-বিবেচনা ছাড়া যা

অপূরণীয়

কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না এমন

নির্বিচার

৫. ঠিক উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. কোন তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমত মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ে?

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ১. ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ | ২. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ |
| ৩. ১৯৭১ সালের উনত্রিশে মার্চ | ৪. ১৯৭১ সালের ছাবিশে মার্চ |

খ. প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর পালন করা হয়-

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ১. ‘স্বাধীনতা দিবস’ হিসাবে | ২. ‘মাতৃভাষা দিবস’ হিসাবে |
| ৩. ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ হিসাবে | ৪. ‘বিজয় দিবস’ হিসাবে |

গ. দেশ স্বাধীন হবার পর বুদ্ধিজীবীদের ক্ষতি-বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় -

১. মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে
 ২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
 ৩. ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে
 ৪. সৎবাদপত্র অফিসে

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঘুমন্ত জাগ্রত **স্বাধীন পরাধীন** **সাধু অসাধু** **লোভী নির্লোভ** **সরল গরল**

ক. অবস্থায় সংবাদ অফিসে শহিদ হন শহিদ সাবের।

খ. দেশ হবার পরে অনেক বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায়।

গ. এদেশের কৃষক জীবনযাপন করে।

ঘ. বাংলাদেশে অনেক সন্ন্যসী বাস করে।

ঙ. আলবদর বাহিনীর লোকেরা ছিল অসাধু ও।

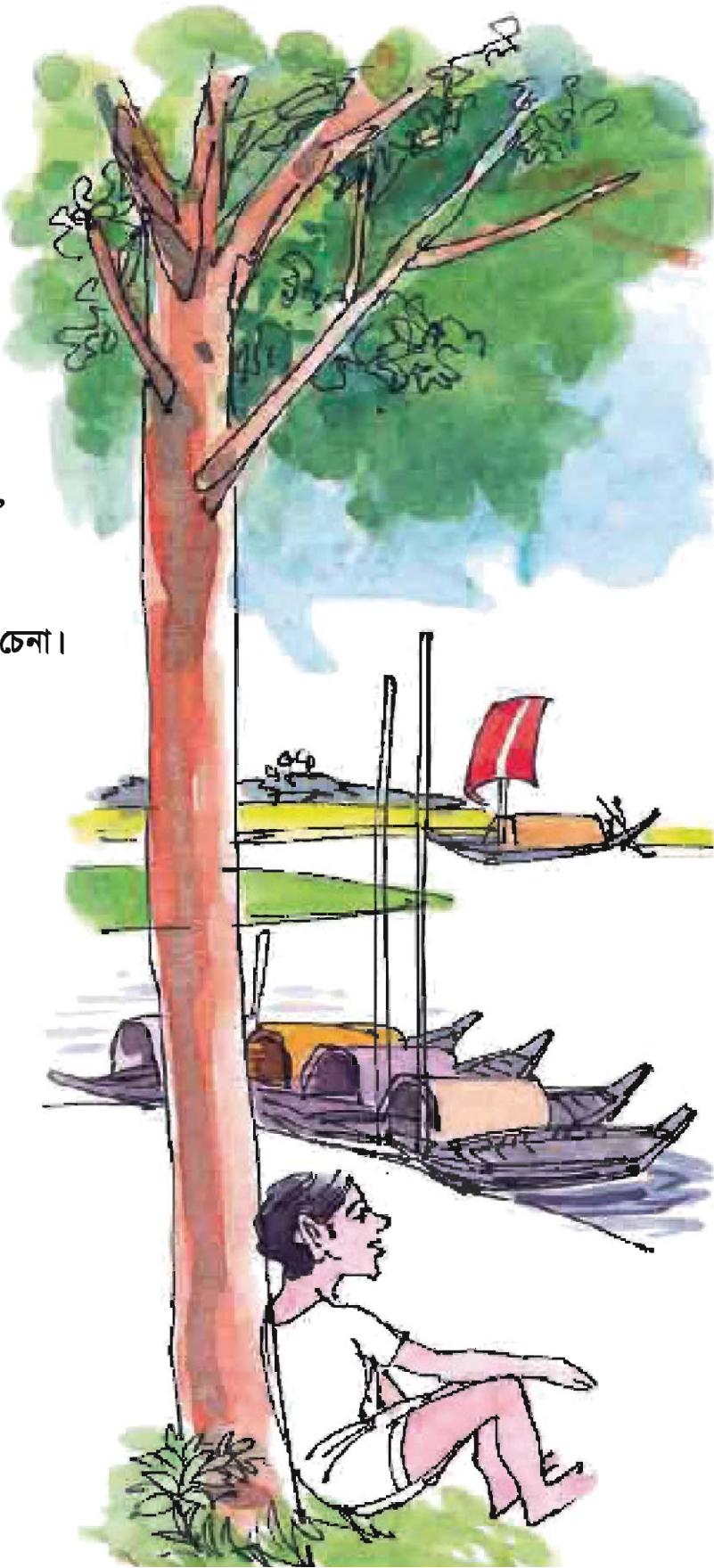
৭. ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী’ সম্পর্কে আমার অনুভূতি লিখি।

স্বদেশ আহসান হাবীব

এই যে নদী
নদীর জোয়ার
নৌকা সারে সারে,
একলা বসে আপন মনে
বসে নদীর ধারে—
এই ছবিটি চেনা।

মনের মধ্যে যখন খুশি
এই ছবিটি আঁকি,
এক পাশে তার জারুল গাছে
দুটি হলুদ পাঞ্চি—
এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।

মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই যেন এর শেষ
নানা কাজের মানুষগুলো
আছে নানান বেশ।
মাঠের মানুষ যায় মাঠে আর
হাটের মানুষ হাটে।
দেখে দেখে একটি ছেলের
সারাটি দিন কাটে।





এই ছেলেটির মুখ
সারাদেশের সব ছেলেদের
মুখেতে টুকটুক।
কে ভূমি ভাই,
প্রশ্ন করি যখন
'ভালোবাসার শিল্পী আমি'
বলবে হেসে তখন।

‘এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,
বাড়ি বাগান পাখপাখালি
সব মিলে এক ছবি,
নেই তুলি নেই রঙ, তবুও
আঁকতে পারি সবই।’

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, অর্থাৎ এদেশে সবখানেই নদী দেখা যায়। ‘স্বদেশ’ কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। একটি ছেলে সেই ছবি দেখছে ও তার মনের ভিতরে ধরে রাখছে। নদীর জোয়ার, নদীর তীরে নৌকা বেঁধে রাখা, গাছে গাছে পাখির কলকাকলি – সবই ছেলেটির মনে নিজের দেশের জন্য মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি জোগাচ্ছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কড়ি টুকটুক শিল্পী পাখপাখালি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

টুকটুকে শিল্পী পাখপাখালির কড়ি

ক. এদেশে আগে এখনকার মতো টাকাপয়সা ছিল না। লোকে কেনা-বেচা
করত দিয়ে।

খ. মেলা থেকে বোনের জন্য একটা জামা কিনে আনব।

গ. জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন বড় মাপের চিত্র।

ঘ. বাংলাদেশের গাছে গাছে শোনা যায় কলকাকলি।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. গ্রাম বাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?

খ. কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?

গ. স্বদেশ কবিতায় কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায়?

ঘ. ‘সব মিলে এক ছবি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৫. নিচের কথাগুলো বুবো নিই।

ক. এমনি পাওয়া এই ছবিটি
কড়িতে নয় কেনা।



খ. মাঠের পরে মাঠ চলেছে
নেই যেন এর শেষ।



গ. এই যে ছবি এমন আঁকা
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,



বাংলাদেশ চির সবুজের দেশ। সোনালি আঁশের দেশ। শস্য-শ্যামল বাংলাদেশের মাঠে মাঠে নানা ফসলের খেত। গাছে
গাছে পাথি। ঝঁকেবেঁকে চলেছে অসংখ্য নদী। এর এক দিকে
পাহাড় আর অন্য দিকে সাগর। সবকিছুতেই প্রকৃতির এক
অপরূপ ছোঁয়া। শিল্পী রং-তুলি দিয়ে এ প্রকৃতিরই ছবি আঁকেন।
কখনো কখনো তা বিক্রি হয়। অনেকে কিনে নেন। কিন্তু
শান্ত-শ্যামল প্রকৃতির এই মন জুড়ানো ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে
কেনা যায় না।

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। মাঠে
মাঠে ফসলের খেত। বাতাস বয়ে যায় তার ওপর দিয়ে।
মনে হয়, নদীর ঢেউ মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। অবারিত খোলা
সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে গ্রাম, আবার মাঠ। গ্রাম মাঠের সাথে
মিশে যায়। মনে হয় সবকিছু মাঠের উপাদান। মাঠের পর
মাঠ চলে গেছে, কোথাও শেষ হচ্ছে না।

নদী, নালা, পাহাড়, সমুদ্র সব মিলে এদেশ ছবির মতো।
এদেশের প্রতিটি ঝাতু বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের
দেশ এটা। প্রকৃতি মাঝে মাঝে রং বদলায়। যেমন ছবিতে
নানান রং ব্যবহার করা হয়। এদেশের মানুষজনও
নানারকমের বেশভূষা পরেন। সব মিলিয়ে সুন্দর এদেশ।



৬. ঠিক উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. নদীর তীরে সারি সারি কী রাখা ছিল?

- ১. জেলেদের জাল
- ২. গাছের গুঁড়ি
- ৩. খড়ের গাদা
- ৪. নৌকা

খ. ছেলেটির সারাদিন কীভাবে কাটে?

- ১. খেলাধূলা করে
- ২. মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে
- ৩. পড়াশোনা করে
- ৪. বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে

গ. ‘স্বদেশ’ কবিতায় ছেলেটি কীভাবে তার ছবি আঁকে?

- ১. রং-তুলি দিয়ে
- ২. পেনসিল দিয়ে
- ৩. নিজের মনের মধ্যে
- ৪. মা-বাবার সহযোগিতা নিয়ে

ঘ. ‘স্বদেশ’ কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন ছবিটি তুলে ধরেছেন?

- ১. বাংলাদেশের শহরের মানুষের ছবি
- ২. নদীর পাড়ের জেলেদের ছবি
- ৩. বাংলাদেশের পাহাড়ি মানুষের ছবি
- ৪. বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি

ঙ. ‘এই ছেলেটির মুখ সারাদেশের সব ছেলেদের মুখেতে টুকটুক’ কথাটি কী অর্থে বোঝানো হয়েছে?

- ১. ছেলেটির মুখের রং
- ২. ছেলেটির মুখের গড়ন
- ৩. ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি
- ৪. ছেলেটির মুখের কথা

৭. শূন্যস্থান পূরণ করি।

‘ এই যে ছবি

.....মতো দেশ,
.....দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,
বাড়ি বাগান
সব মিলে এক.....
নেই নেইতবুও
আঁকতে পারি সবই।’

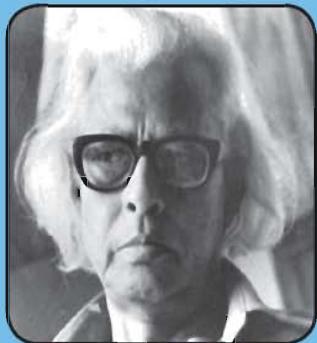
৮. ডান দিক থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক কথাটি নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

- ক. একলা বসে আপন মনে বসে। পুকুর পাড়ে/গাছের তলে/নদীর ধারে
খ. এমনি পাওয়া এই ছবিটি নয় কেন। টাকায়/কড়িতে/ সোনায়
গ. এক পাশে তার জারুল গাছে দুটি। হলুদ পাথি/জারুল ফুল /শালিক পাথি

৯. কর্ম-অনুশীলন।

নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দেশ সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

আমাদের দেশের নাম, দেশের সীমারেখা ও আয়তন, রাজধানী, বিভাগীয় শহর, প্রধান প্রধান নদনদী, জনসংখ্যা ও ভাষা, জাতীয় প্রতীকসমূহ (ফুল, ফল, মাছ, পশু, পাথি), প্রকৃতি ও পরিবেশ।



আহসান হাবীব

কবি-পরিচিতি

কবি আহসান হাবীব ২ৱা জানুয়ারি ১৯১৭ সালে পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি প্রচুর ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার ছন্দ ও শব্দ সহজেই মন কাড়ে। তিনি ছিলেন পেশায় সাংবাদিক। তিনি দীর্ঘদিন নানা পত্রিকার সাহিত্যের পাতার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ‘বৃক্ষ পড়ে টাপুর টুপুর’ ও ‘ছুটির দিন দুপুরে’ তাঁর শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ। ১০ই জুলাই ১৯৮৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

କାଳନମାଳା ଆର କ୍ଵାକନମାଳା

ଅନେକ ଦିନ ଆଗେର କଥା । ଏକ ଦେଶେ ଛିଲ ଏକ ରାଜ୍ଞୀ । ରାଜ୍ଞାର ଏକଟାଇ ପୁତ୍ର । ରାଜପୁତ୍ରେର ସଙ୍ଗେ
ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଖାଲ ଛେଲେର ଖୁବ ଭାବ । ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପରମରକେ ଖୁବ ଭାଲୋବାସେ । ରାଖାଲ ମାଠେ ଗରୁ
ଚରାଯ, ରାଜପୁତ୍ର ଗାହତଳାଯ ବସେ ତାର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ । ନିର୍ମମ ଦୁପୂରେ ରାଖାଲ ବଁଶି ବାଜାଯ ।
ରାଜପୁତ୍ର ତାର ବନ୍ଧୁ ରାଖାଲେର ଗଲା ଜଡ଼ିଯେ ବସେ ସେଇ ସୁର ଶୋନେ । ବନ୍ଧୁର ଜନ୍ୟ ବଁଶି ବାଜିଯେ ରାଖାଲ
ବଡ଼ ସୁଖ ପାଯ । ଆର, ତା ଶୁଣେ ରାଜପୁତ୍ରେର ମନ ଖୁଶିତେ ଝଲମଲିଯେ ଓଠେ । ରାଜପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁର କାହେ
ପ୍ରତିଭା କରେ, ବଡ଼ ହୟେ ରାଜ୍ଞୀ ହଲେ ରାଖାଲକେ ତାର ମତ୍ତୀ ବାନାବେ ।



তারপর একদিন রাজপুত্র রাজা হয়। লোকলস্কর, সৈন্যসামন্তে গমগম করে তার রাজপুরি। রাজপুরি আলো করে থাকে রানি কাঞ্চনমালা। চারদিকে সুখ। এত সুখের মধ্যে রাখালবন্ধুর কথা মনে পড়ে না। রাজপুত্র বন্ধুকে ভুলে যায়।

এদিকে, রাখালবন্ধুর কিন্তু খুব মনে পড়ে বন্ধু রাজপুত্রের কথা। শেষে সে একদিন চলেই আসে বন্ধুকে একটুখানি দেখার জন্য। কিন্তু রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা অমন গরিব রাখালকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। মনতরা কষ্ট নিয়ে সারাদিন প্রাসাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে। রাজার দেখা মেলে না। দিনশেষে মনের কষ্ট নিয়ে দুঃখী রাখাল চলে যায়, কেউ তা জানে না।

এক রাতে রাজা ঘুমাতে যান। কিন্তু ভোরবেলা যখন তার ঘুম ভাঙ্গে, তখনই দেখা যায় কী সর্বনাশ ঘটেছে! রাজা দেখেন যে তার শরীরে গেঁথে আছে অগুনতি সূচ। রাজা কথা বলতে পারেন না, শুতে পারেন না, খেতেও পারেন না। রাজ্যজুড়ে কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। রাজা বোঝেন – প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সেই অপরাধেই আজকে তার এই দশা। রানি কাঞ্চনমালা চোখের জল মুছতে মুছতে রাজ্য দেখাশোনা শুরু করেন।

কাঞ্চনমালা একদিন নদীর ঘাটে মান করতে যান। কোথা থেকে জানি একটা মেয়ে এলো। এসে তাকে বলে, রানির যদি দাসীর দরকার হয়, তো সে দাসী হবে। রাজার শরীর থেকে সূচ খোলার জন্য একজনের দরকার ছিল রানি কাঞ্চনমালার। মেয়েটাকে সেই কাজের জন্য নিয়ে নেন রানি। নদীর ঘাটে গেছেন রানি, সঙ্গে কী করে থাকে টাকাকড়ি! তখন হাতের সোনার কাঁকন দিয়েই রানিকে কিনতে হয় ওই দাসী। তাই তার নাম কাঁকনমালা।

গায়ের গয়নাগুলো কাঁকনমালার কাছে রেখে নদীতে ডুব দিতে যান রানি। চোখের পলকে কাঁকনমালা রানির সব গয়না আর শাড়ি পরে নেয়। রানি ডুব দিয়ে উঠে দেখেন দাসী হয়ে গেছে রানি, আর রানি কাঞ্চনমালা হয়ে গেছেন দাসী।

নকল রানি কাঁকনমালার ভয়ে কাঁপতে থাকে কাঞ্চনমালা। কাঁপতে থাকে রাজপুরীর সকলে। সকলে ভাবতে থাকে, তাদের রানি তো আগে এমন ছিল না।

সুচবিধা রাজা জানতেই পারেন না, তার রাজ্যে আরেক কী ঘোর ঝামেলা এসে গেছে। দুখিনী কাঞ্চনমালা রাজবাড়ির সকল কাজকর্ম করেন। চোখের জল ফেলেন।



হাতে কাঞ্চনমালার একটুও ফুরসত থাকে না। কীভাবে সুচরাজার যত্ন করবে! কীভাবে তার পাশে দু-দশ বসবে! নকল রানি রাজার দিকে ফিরেও তাকায় না। রাজার কফ্টের সীমা থাকে না। সুচবিধা শরীর ব্যথায় টন্টন করে, চিনচিন করে জ্বলতে থাকে। গায়ে মাছি এসে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কে তাকে বাতাস করে, কে তাকে দেখে!

একদিন নকল রানি কাঞ্চনমালাকে একগাদা কাপড় ধূতে পাঠায় নদীর ঘাটে। মাথায় কাপড়ের বোৰা নিয়ে কাঞ্চনমালা এক পা এগোন এক পা থামেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেতে থাকে। এমন সময় কাঞ্চনমালা শোনেন, বনের পাশের গাছতলা থেকে কেমন এক অঙ্গুত মন্ত্র। কে জানি বলেই যাচ্ছে:

পাই এক হাজার সুচ
 তবে খাই তরমুজ!
 সুচ পেতাম পাঁচ হাজার
 তবে যেতাম হাট বাজার!
 যদি পাই লাখ
 তবে দেই রাজ্যপাট!



মাথার বোৰা নামিয়ে
কাঞ্চনমালা যান ছুটে তার
কাছে। বলেন, লাখ লাখ
সূচ চাও তো? আমি দিতে
পারি। এ কথা শুনে সেই মানুষ বটপট

তার সুতার পুটলি তুলে নিয়ে কাঞ্চনমালার সাথে ইঁটা ধরে। যেতে যেতে পথে কাঞ্চনমালা
চোখের জল ফেলতে ফেলতে দুঃখের সব কথা বলে। অচেনা মানুষ শোনে, মুখ থমথমে হয়ে
যেতে থাকে তার।

রাজপুরীতে গিয়ে ওই অচিন মানুষ সূচ নেবার কথাটাও বলে না। বলতে থাকে অন্য কথা। বলে,
আজকের দিন বড় শুভ দিন। আজ হচ্ছে পিটকুড়ুলির ব্রত, আজকের দিনে রানিদের পিঠা বিলাতে
হয়— এমনই নিয়ম। নকল রানি পিঠা বানাতে যায়। সে কাঞ্চনমালাকেও পিঠা বানাতে ফরমাস
দেয়। নকল রানি বানায় পিঠা। সে পিঠা কেউ মুখেও তুলতে পারে না, এমনই বিস্বাদ! দুখিনী
কাঞ্চনমালা বানান চন্দ্রপুলি, মোহনবঁশী, ক্ষীর মূরলি পিঠা। মুখে দেওয়া মাত্র সকলের মন ভরে
যায়। এমনই স্বাদ তার। নকল রানি উঠানে আল্লনা দিতে যায়। কোথায় নকশা কোথায় কী—
এখানে এক খাবলা রৎ লেপে দেওয়া, ওখানে এক খাবলা লেপা। দেখতে যে কি অসুন্দর দেখায়!
আর কাঞ্চনমালা আঁকেন পদ্মলতা। তার পাশে আঁকেন সোনার সাত কলস, ধানের ছড়া, ময়ুর-
চূপ্তুল। লোকে তখন বুঝতে পারে কে আসল রানি, আর কে দাসী।

তখন সেই অচেনা মানুষটা কাঁকনমালাকে ডাক দেয়, বলে—হাতের কাঁকনে কেনা দাসী, জলদি
সত্য কথা বল। কাঁকনমালার সেবি রাগ। সে গর্জে উঠে জল্লাদকে হুকুম দেয়, অচেনা মানুষ
আর কাঁকনমালার পর্দান নিতে। জল্লাদ ওদের ধরতে আসার আগেই অচেনা মানুষ তার সূতার
পুটলিকে হুকুম দেয়। এক গোছা সুতা গিয়ে জল্লাদকে আক্ষেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। নকল রানি আবার
গর্জে ওঠার আগেই অচিন মানুষ নতুন মন্ত্র পড়া ধরে:

সূতন সূতন সরুলি, কোন দেশে ঘর
সুচ রাজার সুচ গিয়ে আপনি পর।

সজ্জে সজ্জে লাখ লাখ সুতা রাজার গায়ের লাখ লাখ সুচে ঢুকে যায়। আবার মন্ত্র পড়ে অচিন
মানুষ। সব সুচ রাজার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে নকল রানির চোখেমুখে বিধে যায়। জল্লা
যন্ত্রণায় ছটফট করে। নকল রানি শেষে মারা যায়। কাঁকনমালার দুঃখের দিন শেষ হয়।



এদিকে, রাজা বহু বছর পরে চোখ মেলেন। সামনে কে যেন দাঢ়িয়ে! কে! সেই রাখালবন্ধু! রাজা দুহাতে জড়িয়ে ধরেন তাকে। রাজা ক্ষমা চান তাঁর বন্ধুর কাছে। কথা দিয়ে কথা রাখেননি। রাজা বলেন, আজ থেকে তুমি আমার মন্ত্রী। এই রইল রাজ্য আমার, শুধু তুমি আমার পাশে থেকো! সারা জীবনের জন্য থেকো। রাখাল বন্ধু কি তখন না থেকে পারে!

রাজা তাঁর বন্ধুকে নতুন সোনার বাঁশি গড়িয়ে দেন। রাখাল সারাদিন মন্ত্রীর কাজ করে, প্রজাদের দুঃখ সরিয়ে তাদের মুখে হাসি আনে। সারাদিনের কাজ শেষে রাজা বন্ধুকে নিয়ে যান। পুরানো দিনের মতো রাখালবন্ধু তখন বাঁশি বাজায়, আর রাজা সেই সুর শোনেন। সুখে রাজার মন ভরে ওঠে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

আফেপৃষ্ঠে গর্দান গর্জে ওঠা স্বাদ বিস্বাদ পুঁটলি ফুরসত
টন্টন চিনচিন মায়াবতী কাঁকন রক্ষী রাজপ্রাসাদ পরস্পর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জ্ঞানগায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরস্পরের

বিস্বাদ

আফেপৃষ্ঠে

পুঁটলিটি

ফুরসত

টন্টন

ক. তার হাতের রান্না এমন যে মুখেই তোলা যায় না।

খ. বৃন্দ লোকটি তার স্যত্ত্বে একপাশে রেখে দিল।

গ. লোকটির কাজের চাপ এত বেশি যে দম ফেলার নেই।

ঘ. তার সমস্ত শরীর ব্যথায় করছে।

ঙ. তারা দুজন বন্ধু।

চ. গ্রামের মাঝা ছেলেটিকে বেঁধে রেখেছে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বাণি ও শিখি।

- ক. রাজপুত্র কোথায় বসে রাখাল বন্ধুর বাঁশি শুনত?
- খ. রাজপুত্র রাখাল বন্ধুর কথা ভুলে যায় কেন?
- গ. রাজা কেন মনে করলেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণেই তাঁর এই দশা?
- ঘ. তোমার মা বাড়িতে কী ধরনের পিঠা বানায় লেখ?
- ঙ. অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে না এলে কী হতো?
- চ. তুমি কী মনে কর অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রক্ষা পেল?
- ছ. কীভাবে লোকেরা নকল রানিকে বুঝে ফেলল?
- জ. রাজা কীভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন?
- ঘ. কাথনমালা এবং কাঁকনমালার চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।
- ঙ. গল্পটা তোমার কেমন লেগেছে? বর্ণনা দাও।

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কানা	হাসি	চেনা	অচেনা	ভালো	মন্দ	বড়	ছেট	আগো	অন্ধকার
------	------	------	-------	------	------	-----	-----	-----	---------

- ক. সন্তানের মৃত্যুতে তিনি ধরে রাখতে পারলেন না।
- খ. লোকটির ফাঁদে পা দিয়ে সে তার সবকিছু হারিয়েছে।
- গ. রাসেল বয়সে হলেও সংসারের অনেক কাজে মাকে সাহায্য করে।
- ঘ. লোকটিকে আমি কোথায় যেন দেখেছি, খুব মনে হচ্ছে।
- ঙ. বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় চারদিকে নেমে এলো।

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

নিম্নুম সুখ রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা টনটন ময়ুর পদ্মলতা চিনচিন ঝলমল বাঁশি রাজ্য

৬. নিচের বাক্যাংশ ও বাক্যগুলো পড়ি।

ব্যথায় টনটন করা – খুব ব্যথা করা। সুচরিধা রাজার শরীর দিনরাত ব্যথায় টনটন করত।

খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠা – মন আনন্দে উঠে উঠা। রাখাল বন্ধুর বাঁশির সুর শুনে রাজপুত্রের
মন খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠত।

৭. গল্পে ‘টন্টন’, ‘থমথম’ এ রকম শব্দ আছে। এই ধরনের আরও কয়েকটি শব্দের ব্যবহার শিখি (এখানে একটি দেখানো হলো)।

তন্তন – চারদিকে মাছি তন্তন করছে।

টন্টন –

থৈথৈ –

রইরই –

কনকন –

ঝনঝন –

৮. বিপরীত শব্দ শিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য শিখি।

সুখ	দুঃখ	মা-বাবার মনে কখনো দুঃখ দেয়া উচিত নয়।
মায়া
স্বাদ
কষ্ট
নকল
রানি
রাজপুত্র
অসুন্দর
খুশি

৯. যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করে পড়ি ও শিখি।

ঙ্ক – ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ক্ষ – পরিপক্ষ, ক্ষুচিৎ

ঙ্গ – গঢ়ার, পাষণ্ড

ণ্ট – ঘণ্টা, কণ্টক

অবাক জলপান

সুক্ষ্মার রায়

পাত্রগণ : পথিক | বুড়িওয়ালা | বৃন্দ | ছেকরা | খোকা | মামা |

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

(ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ। পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা গুটিলি। উষ্কখুঞ্চক চুল। ভাস্ত চেহারা)

পথিক : নাঃ একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেক্ষায় মগজের ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে?



গেরস্তর বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘূম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চ্যাঁচাতে গেলে হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও লোকজন দেখছিনে। – ওই একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

[বুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক : মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

বুড়িওয়ালা : জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি –

পথিক : না, না আমি তা বলিনি –

বুড়িওয়ালা : না, কাঁচা আম আপনি বলেননি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম –

পথিক : না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে –

বুড়িওয়ালা : চাচ্ছেন না তো, ‘কোথায় পাব’ ‘কোথায় পাব’ কচ্ছেন কেন? খামাখা এরকম করবার মানে কী?

পথিক : আপনি ভুল বুঝছেন – আমি জল চাচ্ছিলাম –

বুড়িওয়ালা : জল চাচ্ছেন তো ‘জল’ বললেই হয় – ‘জলপাই’ বলবার দরকার কী? জল আর জলপাই কি এক হলো? আলু আর আলুবোখরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙ্গাও তাই? বরকে কি আপনি বরকস্দাজ বলেন? চাল কিনতে গিয়ে কি চালতার খৌঁজ করেন?

পথিক : ঘাট হয়েছে মশাই। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

বুড়িওয়ালা : অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন বুড়ি নিয়ে যাচ্ছি – তবে জল চাচ্ছেন কেন? বুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

[বুড়িওয়ালার প্রস্থান]

[পাশের বাড়ির জানালা খুলিয়া এক বৃন্দের হাসিমুখ বাহিরকরণ]

বৃন্দ : কী হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক : আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাচ্ছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না – কেবলই সাত-পাঁচ গপ্পো করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম তো রেগেমেগে অস্থির।

বৃন্দ : আরে দূর দূর। তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কী আর বলবেই বা কী? ওর যে দাদা আছে, খালিসপুরে চাকরি করে।

- সেটা তো একটা আন্ত গাধা। ও মুখ্যটা কী বলবে তোমায় ?
- পথিক : কী জানি মশাই-জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল বলে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে-
- বৃন্দ : হঁঁঁঁ-ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকামতো দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি তো ফর্দ করেছেন, আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তো আমি এক্ষুণি পঁচিশটা বলে দেব -
- পথিক : না মশাই, গুনিনি-আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই -
- বৃন্দ : তোমার কাজ না থাকলেও আমার কাজ থাকতে পারে তো? যাও, যাও, মেলা বকিয়ো না-একেবারে অপদার্থের একশেষ।
- [বৃন্দের সশঙ্কে জানালা বন্ধকরণ]
[নেপথ্যে বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ]
- [পৃষ্ঠিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল।
সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্তাদ।]
- পথিক : ওহে খোকা! এদিকে শুনে যাও তো?
- [বৃক্ষমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাঢ়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন]
- মামা : কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ? - (পথিককে দেখিয়া) ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোনও ছোকরা বুঝি! আপনার কী দরকার?
- পথিক : আজ্ঞে, জলতেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছ-তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।
- [মামার তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া]
- মামা : কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন, কী খবর চান, কী জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিছি।
- [পথিককে মামার ঘরে টানিয়া নেওয়া]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘরের ভিতর

[ঘর নানা রকম যন্ত্র, নকশা, রাশি-রাশি বই ইত্যাদিতে সজ্জিত]

- মামা : কী বলছিলেন? জলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?
- পথিক : আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি!
- মামা : আ হা হা! কী উৎসাহ, কী আগ্রহ! শুনেও সুখ হয়। এরকম জানবার আকাঙ্ক্ষা ক-জনের আছে, বলুন তো? বসুন! বসুন! (কতকগুলি ছবি, বই আর এক টুকরো খড়ি বাহির করিয়া) জলের কথা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, জল কাকে বলে, জলের কী গুণ –
- পথিক : আজ্ঞে, একটু খাবার জল যদি –
- মামা : আসছে – ব্যস্ত হবেন না। একে একে সব কথা আসবে। জল হচ্ছে দুইভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন।
- পথিক : এই মাটি করেছে!
- মামা : বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয়-হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই, হবে জল! শুনছেন তো?
- পথিক : দেখুন মশাই! কী করে যে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা তেবে পাইনে। বলি, বারবার করে যে বলছি- তেফ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা তো কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেফ্টায় জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?
- মামা : শুনেছি বইকি, চোখে দেখেছি। বদ্যনাথকে কুকুড়ে কামড়াল, বদ্যনাথের হলো হাইড্রোফোবিয়া- যাকে বলে জলাতঙ্গ। আর জল খেতে পারে না-যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় থিচ ধরে। মহা মুশকিল।
- পথিক : নাঃ এদের সঙ্গে পেরে ওঠা গেল না- কেনই মরতে এসেছিলাম এখানে? বলি মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধি জল ছাড়া ভালো জল খাঁটি জল কিছু নেই?
- মামা : আছে বইকি! এই দেখুন না বোতল-ভরা টাটকা খাঁটি ডিস্টিল ওয়াটার- যাকে বলে পরিশুত জল।



[বড় সবুজ একটি বোতল আনিয়া মামা পথিককে দেখাইলেন]

পথিক

: (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায় ?

মামা

: না, ও জল খায় না, ওতে তো স্বাদ নেই- একেবারে বোবা জল কিনা, এইমাত্র তৈরি করে আনল- এখনও গরম রয়েছে।

[পথিকের হতাশ ভাব]

তারপর যা বলছিলুম শুনুন- এই যে দেখছেন গন্ধুরায়ালা নোংরা জল- এর মধ্যে দেখুন এই গোলাপি জল ঢেলে দিলুম- ব্যস, গোলাপি রং উড়ে সাদা হয়ে গেল। দেখলেন তো ?

পথিক

: না মশাই, কিছু দেখিনি, কিছু বুবাতে পারিনি, কিছু মানি না ও কিছু বিশ্বাস করি না।

মামা

: কী বললেন। আমার কথা বিশ্বাস করেন না ?

পথিক

: না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিছু বিশ্বাস করব না।

- মামা : বটে, কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি- আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে
দেখিয়ে দিছি।
- পথিক : তা হলে দেখান দেখি। সাদা, খাঁটি চমৎকার এক গেলাস খাবার জল নিয়ে দেখান
দেখি। যাতে গন্ধ নেই, পোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লা-টয়লা কিছু
নেই, তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি। খুব বড় এক গেলাস ভর্তি জল নিয়ে
দেখান তো!
- মামা : এক্ষুণি দেখিয়ে দিছি- ওরে ট্যাপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাস জল
নিয়ে আয় তো।

[পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়]

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিছি। ওই জলে কী রকম হয়, আর নোংরা জলে
কী রকম তফাত হয়, আমি সব দেখিয়ে দিছি।

[জল লইয়া ট্যাপার প্রবেশ]

এই খানে রাখ।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ- মামার হাত হইতে জল
কাঢ়িয়া এক নিঃশ্঵াসে চুমুক দিয়া শেষ করা।]

- পথিক : আঃ বাঁচা গেল!
- মামা : (চটিয়া) এটা কী রকম হলো মশাই?
- পথিক : পরীক্ষা হলো- এক্সপেরিমেন্ট। এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান
তো? কীরকম হয়?
- মামা : (ভীষণ রাগিয়া) কী বললেন?
- পথিক : আচ্ছা থাক, এখন নাই বা খেলেন- পরে খাবেন। আর গাঁয়ের মধ্যে আপনার
মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সবকটাকে খানিকটা করে খাইয়ে
দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন- আমি খুশি
হয়ে ছুটে আসব, হতভাগা জোচোর কোথাকার।

[পথিকের দ্রুত প্রস্থান]

[পাশের গলিতে সুর করিয়া সে হাঁকিতে লাগিল - ‘অবাক জলপান’]

অনুশীলনী

১. নাটকটির মূলভাব জেনে নিই।

সুকুমার রায়ের ‘অবাক জলপান’ ছেউ একটি নাটক। এতে একটি গল্প বলা হয়েছে। তবে পথিক, ঝুড়িওয়ালা, বৃদ্ধ, খোকার মামা— এই চারজন লোকের কথোপকথন বা সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পটি বলা হয়েছে বলে এটি নাটক। ছেউ নাটককে নাটক বলে। ‘অবাক জলপান’ নাটকার কাহিনি হচ্ছে- ভীষণ তৃক্ষার্ত একটি লোক তেষ্টায় নানান জনের কাছে গিয়ে জল চাইছে, কিন্তু কেউ তাকে জল দিচ্ছে না। বরং তার কথা বলার মধ্যে নানারকম খুঁত ধরছে। শেষ পর্যন্ত বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে ফন্দি এঁটে এক বিজ্ঞানীর নিকট থেকে সে জল আদায় করল। এটি একটি হাসির গল্প।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গেরস্ট বরকন্দাজ তেষ্টা খাটিয়া এক্সপেরিমেন্ট বুক্ষমূর্তি

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গেরস্ট বরকন্দাজ এক্সপেরিমেন্ট তেষ্টায় বুক্ষমূর্তি খাটিয়ার

ক. বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে।

খ. বরকে কি আপনি বলেন?

গ. একটা লোক জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না।

ঘ. পথিক ক্লান্ত হয়ে অবশেষে ওপর বসে পড়ল।

ঙ. নোংরা জলের ভিতর কী আছে তা করে বলা যাবে।

চ. লোকটিকে দেখলেই ভয় লাগে।

৪. প্রশ়ঙ্গুলোর উভয় বলি ও নিখি।

- ক. ‘বোবা জল’ বলতে কী বোবায় ?

খ. ‘জলাতঙ্ক’ কাকে বলে ?

গ. জলের তেষ্টায় পথিকের মন ও শরীরের অবস্থা কী হয়েছিল ? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. মনে কর এই পথিকের সঙ্গে তুমি কথা বলছ । তোমাদের দু জনের কথোপকথন
কেমন হতে পারে তা নিজের ভাষায় লেখ ।

ঙ. পথিককে ঝুড়িওয়ালা কত রকম জলের কথা শুনিয়েছিল ? নামগুলো লেখ ।

চ. তুমি তোমার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ইচ্ছেমতো একটি নাটক লেখ ।

৫. ঠিক উভয়টিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ক. অবাক জলপান কোন ধরনের রচনা ?

 ১. নাটিকা
 ২. ছোটগল্প
 ৩. প্রবন্ধ
 ৪. উপন্যাস

খ. পথিক ঝুড়িওয়ালার কাছে কী চেয়েছিল ?

 ১. কাঁচা আম
 ২. জল
 ৩. জলপাই
 ৪. পাকা আম

গ. কুকুরে কামড়ালে মামা কোন রোগের কথা বলেছিল ?

 ১. ডিপথেরিয়া
 ২. আমাশয়
 ৩. জলাতঙ্গ
 ৪. টাইফয়োড

ঘ. পথিক কয়জনের কাছে খাবার জল চেয়েছিল ?

 ১. ৪ জন
 ২. ৩ জন
 ৩. ২ জন
 ৪. ৫ জন

ঙ. বৃদ্ধ পথিককে কয় ধরনের জলের কথা বলতে চেয়েছিল ?

 ১. পঁচিশ
 ২. ত্রিশ
 ৩. দশ
 ৪. সাতাশ

চ. পথিক শেষ পর্যন্ত কার কাছ থেকে খাবার জল পেয়েছিল?

- | | |
|----------------|----------|
| ১. বালক | ২. মামা |
| ৩. ঝুড়িওয়ালা | ৪. বৃন্দ |

ছ. নাটিকাটিতে বিজ্ঞানীর চরিত্রে কাকে দেখানো হয়েছে?

- | | |
|----------------|----------|
| ১. ঝুড়িওয়ালা | ২. বৃন্দ |
| ৩. বালক | ৪. মামা |

৫. কর্ম-অনুশীলন

শিক্ষকের সহায়তায় নাটিকাটি শ্রেণিতে ধারাবাহিকভাবে অভিনয় করি।



সুকুমার রায়

কবি-পরিচিতি

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটদের জন্য হাসির গল্প ও কবিতা লিখেছেন। ‘আরোল-তাবোল’, ‘হ-য-ব-র-ল’, ‘পাগলা দাশু’, ‘বহুরূপী’, ‘খাইখাই’, ‘অবাক জলপান’ তাঁর অমর সৃষ্টি। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন, আর পুত্র সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিদ্যাত চলচিত্র পরিচালক হয়েও শিশু-কিশোরদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন।

ঘাসফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মেত্র

আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা,
তুলো না মোদের দলো না পায়ে
ছিঁড় না নরম পাতা।

শুধু দেখ আর খুশি হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা।

ধরার বুকে স্নেহ-কণাগুলি
ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি—
শুনি আর দুলি বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

ঘাসফুল যে কী আনন্দে বেঁচে আছে, জীবনকে উপভোগ করছে সে কথাই এখানে তারা নিজেরা বলছে। ফুল ছিঁড়ে, পায়ের নিচে পিষে ফেলে মানুষ যেন তাদের কষ্ট না দেয়—সেই মিনতি তারা করছে। গাছে ফুল ফুটলে তা দেখে আনন্দ পাওয়া চাই। ফুল ছেঁড়ার অর্থ ফুলকে মেরে ফেলা। গাছের যেমন প্রাণ আছে, ফুলেরও তেমনই প্রাণ আছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে ঝুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দোলাই কিরণ ধরা তারারা ফোটে স্নেহ-কণা রূপকথা

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দোলায় কিরণ ধরার তারারা স্নেহ-কণা রূপকথার ফোটে

ক. ছোট ছোট ফুল হাওয়াতে মাথা।

খ. সকালে সূর্যের ততটা তীব্র হয় না।

গ. বুকের স্নেহ-কণাগুলি ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।

ঘ. আধার আকাশে মিটিমিটি করে চায়।

ঙ. ফুল গাছে ফুল।

চ. বই পড়তে অনেক ভালো লাগে।

ছ. মা দিয়ে আমাদের ভরে রাখেন।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?

খ. ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?

গ. ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?

ঘ. ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?

৫. কবিতার অংশটি ব্যাখ্যা করি।

মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা নীল আকাশের বাঁশি—
শুনি আর দুলি শাঙ্ক বাভাসে
যখন তারারা ফোটে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় ফুল সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

ফুলের নাম:

ফুলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা:

কোথায় হয়:

ব্যবহার:

কেন প্রিয় ফুল:

খ. পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা প্রেরিতে আবৃত্তি করি।



কবি-পরিচিতি

জ্যোতিরিষ্ঠ মৈত্র ১৯১১ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত কবি ও গায়ক। তিনি অনেক উদ্দীপনামূলক দেশপ্রেমের গান লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। সঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তিনি ১৯৭৭ সালের ২৬শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

জ্যোতিরিষ্ঠ মৈত্র

মাটির নিচে যে শহর

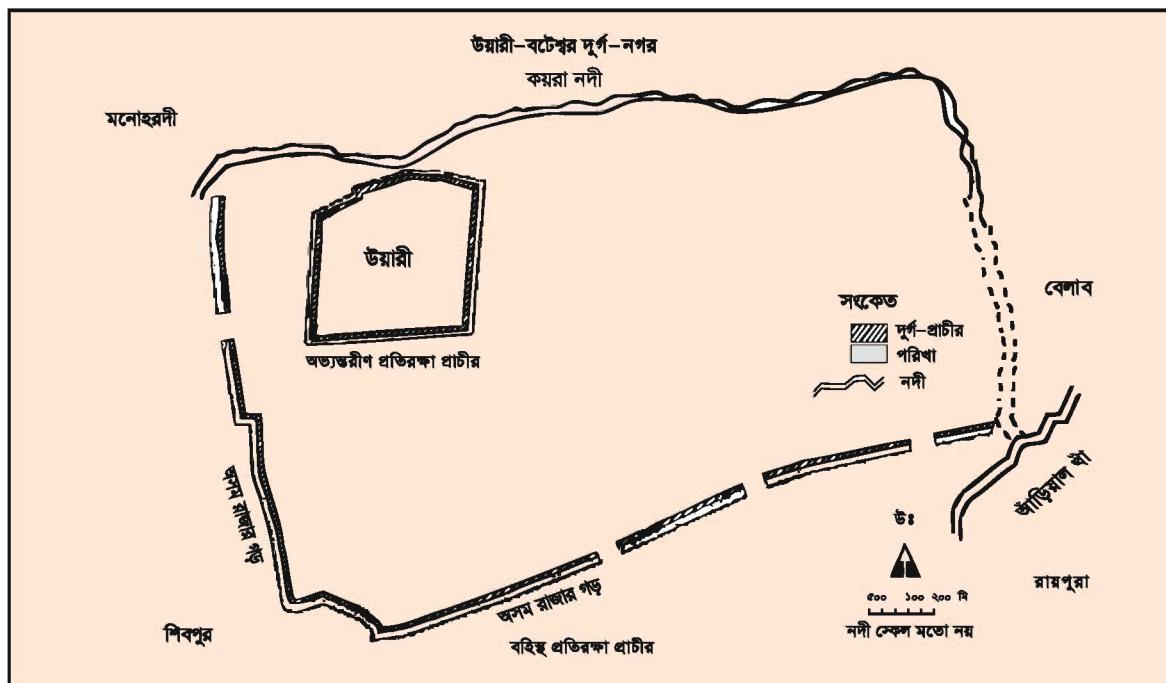
বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কয়েকটা প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে। সে সব স্থানের নাম তোমরা হয়তো জান, যেমন- ময়নামতি, মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর। এগুলো কোনোটি হয়তো তোমরা দেখেও থাকবে। সেগুলো সবই মাটির উপরে, টিবির আকারে, তাই সহজে দূর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু এদেশে মাটির নিচে রয়েছে এক প্রাচীন নগর-সভ্যতা।



প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

কুমিল্লার লালমাই আর বরেন্দ্র অঞ্চলের পাহাড়পুর এবং মহাস্থানগড়ের মতো মধুপুর গড়ের অধিকাংশ ভূমির গঠন একই রকম। এ অঞ্চল মধুপুর গড় নামে পরিচিত। মৃণিকা-বিজ্ঞানীগণ বলেন, এই অঞ্চলের মাটি হাজার হাজার বছরের পুরানো। আজ থেকে বহু বছর আগে আমাদের এই দেশের ভূপৃষ্ঠ ঠিক এই রকম ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব সাত থেকে ছয় শতকে বর্তমানের গঙ্গা নদীর তীরে সুসভ্য জনমানুষের বসতি ছিল। এখানে ছিল সুন্দর নগরী। এখনকার নরসিংদী দিয়ে বয়ে গেছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ। ১৭৭০ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ পেরিয়ে নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার দক্ষিণ দিক থেকে প্রাচীন সোনারগাঁ নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিলু।

এরপর সম্ভবত বড় ভূমিকম্প, বন্যা-প্লাবন বা নদীভাঙ্গন হয়েছিল কোনো এক সময়ে। ফলে এসব অঞ্চলে ভূপ্রকৃতির বড় রকমের ওলটপালট হয়। ১৮৯৭ সালে প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প হয় আমাদের দেশে। ফলে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা আর জনবসতি সবই প্রাকৃতিক কারণে বদলে যায়। এখনো তোমরা দেখে থাকে নদীর পাড়ের জমি, ঘরবাড়ি, গ্রাম আর রাস্তা-ঘাট ভাঙ্গে। আবার বিশাল নদীর অন্য দিকে বিস্তীর্ণ চর পড়ে। শত শত বছর আগে থেকেই এইভাবে চলে আসতে থাকে ভাঙ্গা-গড়া। মাটিচাপা পড়ে যায় এক একটি নগর-জনপদ। মাটি খুঁড়ে এমনি এক সুপ্রাচীন নগর-জনপদের দেখা পাওয়া গেছে বাংলাদেশে। সেই স্থানের নাম নরসিংহী জেলার উয়ারী-বটেশ্বর। উয়ারী-বটেশ্বর ঢাকা থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নরসিংহীর বেলাব ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত। এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।



আসলে উয়ারী এবং বটেশ্বর পাশাপাশি দুটি গ্রাম। এই দুই গ্রামে প্রায়ই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যেত। ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খনন করার সময় একটা পাত্রে জমানো কিছু মুদ্রা পায়। স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মোহন্দাদ হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এগুলো ছিল বঙাদেশের এবং ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা। সেটাই ছিল উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দর্শন সংগ্রহের প্রথম চেষ্টা। তিনি তাঁর ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠানকে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ১৯৫৫ সালে বটেশ্বর গ্রামের শ্রমিকরা দুটি লোহপিণ্ড ফেলে যান। ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা ভারি লোহার পিণ্ডগুলো হাবিবুল্লাহ পাঠান বাবাকে নিয়ে

দেখান। তিনি অভিভূত হন। ১৯৫৬ সালে উয়ারী গ্রামে মাটি খননকালে ছাপাঞ্চিত রৌপ্য মুদ্রার একটি ভাঙ্ডার পান তিনি। তাতে চার হাজারের মতো মুদ্রা ছিল। ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে হাবিবুল্লাহ উয়ারী-বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নির্দর্শন সংগ্রহ করেন। পরে তিনি সেগুলো জাদুঘরে জমা দেন। অনেক পরে ২০০০ সালে এখানে শুরু হয় খনন কাজ। নেতৃত্ব দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান। খনন করে পাওয়া যায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর। আরও পাওয়া যায় ইটের স্থাপত্য, বন্দর, রাস্তা, গলি, পোড়ামাটির ফলক, মূল্যবান পাথর, পাথরের বাটখারা, কাচের পুঁতি, মুদ্রাভাণ্ডার। মুদ্রাগুলো ভারত উপমহাদেশের মধ্যে প্রাচীনতম। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মাটির নিচে থাকা এই স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরানো।

সে সময় শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস। ছিল নগর সভ্যতা। পূর্ব-দক্ষিণ দিক দিয়ে বৈরবের মেঘনা হয়ে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য সুদূর জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা, ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সুদূর রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত ‘উয়ারী-বটেশ্বর’ রাজ্যের যোগাযোগ ছিল।

উয়ারী-বটেশ্বরের আশেপাশে প্রায় পঞ্চাশটি পুরানো জায়গা পাওয়া গেছে। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম, যেমন-রাজ্বার টেক, সোনারুতলা, কেন্দুয়া, মরজাল, টঙ্গীরাজ্বার বাড়ি, মন্দিরভিটা, জানখারটেক, টঙ্গীরটেকে প্রাচীন বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। দুর্গ-প্রাচীর, ইটের স্থাপত্য, মুদ্রা, গয়না, ধাতব বস্তু, অস্ত্র থেকে শুরু করে জীবনধারণের যত প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তা থেকে সহজেই বলা যায়, এখানকার মানুষ যথেষ্ট সভ্য ছিল। এই স্থানের বসতি এলাকাটি সম্ভবত রাজ্যের রাজধানী ছিল। অধ্যাপক সুফি

মোস্তাফিজুর রহমানের ধারণা, এই প্রত্নতত্ত্ব স্থাপত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ আর যথাযথ পরিকল্পনায় গড়া। এই সভ্যতা প্রাচীনকালে ‘সোনাগড়া’ নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল। উয়ারী-বটেশ্বর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শিবপুর উপজেলা। এখানকার মন্দিরভিটায় এক বৌদ্ধ পদ্মমন্দিরও আবিষ্কৃত হয়েছে। জানখারটেকে একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক আশ্চর্য সব নির্দর্শন পাওয়া যেতে পারে এই এলাকা থেকে।



প্রাচীন মুদ্রা

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপত্যকা জনপদ প্রাচীনতম অভিভূত নির্দেশন খ্রিস্টপূর্ব
ঐতিহাসিক

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঐতিহাসিক

উপত্যকা

অভিভূত

নির্দেশন

প্রাচীনতম

ক. পাহাড়পুর আমাদের দেশে অতি একটি বিহার।

খ. ক্রমে ক্রমে অনেক আশ্চর্য পাওয়া যাচ্ছে উয়ারী-বটেশ্বরে।

গ. উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের নির্দেশন।

ঘ. পাহাড় ও পর্বতের মাঝে সমতল ভূমিকে বলে।

ঙ. আমি জাদুঘর দেখে হয়ে গেলাম।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশন বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশনগুলি সম্পর্কে যা
জান লেখ।

খ. উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশন কীভাবে মানুষের নজরে এলো?

গ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত? এই এলাকাটির
প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পিছনে কী কারণ তা লেখ।

ঘ. ব্রহ্মপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায়?

ঙ. কোন কোন নির্দেশন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায়?

চ. উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যা ধারণা করেছেন তা বর্ণনা কর।

৪. বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

ছাপাঞ্জিত-ছাপ হলো দাগ বা চিহ্ন দেওয়া। কোনো কিছুর ওপর ছাপ দিয়ে অঙ্কন করা।
বাংলাদেশের মুদ্রার ওপর শাপলা ফুল ছাপাঞ্জিত আছে।

এখানে দুটি শব্দ, ছাপ + অঙ্কিত মিলে হয়েছে ছাপাঞ্জিত। এই রকম দুই শব্দের মিলন
হলে তাকে বলে সন্ধি। যেমন, নীল + আকাশ= নীলাকাশ।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. উয়ারী-বটেশ্বরের প্রাচুর প্রাচীন নির্দশন সংগ্রহ করে জাদুঘরে কে জমা দেন?

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ১. হাসিবুল্লাহ পাঠান | ২. হফিজুল্লাহ পাঠান |
| ৩. হাবিবুল্লাহ পাঠান | ৪. শরিফুল্লাহ পাঠান |

খ. একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে-

- | | |
|--------------|----------------|
| ১. ভাষানটেকে | ২. জানখাঁরটেকে |
| ৩. টেকেরহাটে | ৪. টঙ্গীরটেকে |

গ. কোন নদীপাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস?

- | | |
|---------------|----------------|
| ১. বুড়িগঙ্গা | ২. ব্ৰহ্মপুত্ৰ |
| ৩. শীতলক্ষ্যা | ৪. মেঘনা |

ঘ. ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ বয়ে গেছে কোন অঞ্চলের পাশ দিয়ে?

- | | |
|--------------|-------------|
| ১. মধুপুর | ২. ময়নামতি |
| ৩. পাহাড়পুর | ৪. নরসিংহদী |

ঙ. এই সভ্যতা প্রাচীনকালে কী নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল?

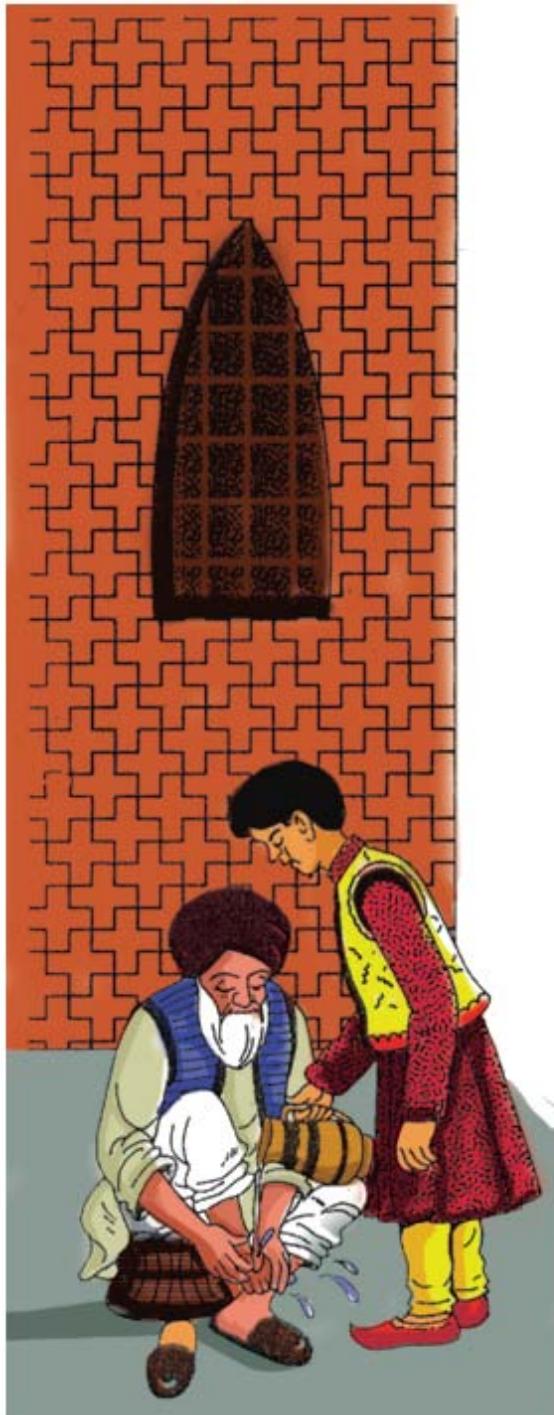
- | | |
|-------------|-------------|
| ১. রূপাগড়া | ২. মনগড়া |
| ৩. সোনাগড়া | ৪. সোনাবুরি |

৬. কর্ম-অনুশীলন।

বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে রচনা লিখি।

শিকাগুরুর ঘরীদা

কাজী কামের সওদাব



বাদশাহ আলমগীর-

কুমারে ভাইর পঞ্চাইত এক মৌলবি দিল্লির ।

একদা প্রভাতে শিয়া

দেখেন বাদশাহ- শাহজাদা এক পাত্র হচ্ছে নিয়া

চালিতেছে বারি পুরুর চরণে

পুলকিত হৃদে আনত-নয়নে,

শিক্ষক শুধু নিজ হাত দিয়া নিজেরি পায়ের ধূলি
ধূরে-মুহে সব করিছেন সাক সংস্থারি অঙ্গুলি ।

শিক্ষক মৌলবি

ভাবিলেন, আজি নিজার নাহি, যার বুঝি তাঁর সবি ।

দিল্লিপতির পুত্রের করে

লইবাহে পানি চরণের পয়ে,

স্পর্ধার কাজ, হেন অপরাধ কে করেছে— কোন কালে !

ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার লেখা দেখা দিল তাঁর ভালে ।

হঠাতে কী ভাবি উঠি

কহিলেন, আমি ভয় করি নাক, যার যাবে শির টুটি,

শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার

দিল্লির পতি সে তো কোন ছার,

ভয় করি নাক, ধারি নাক ধার, মনে আছে মোর বল,

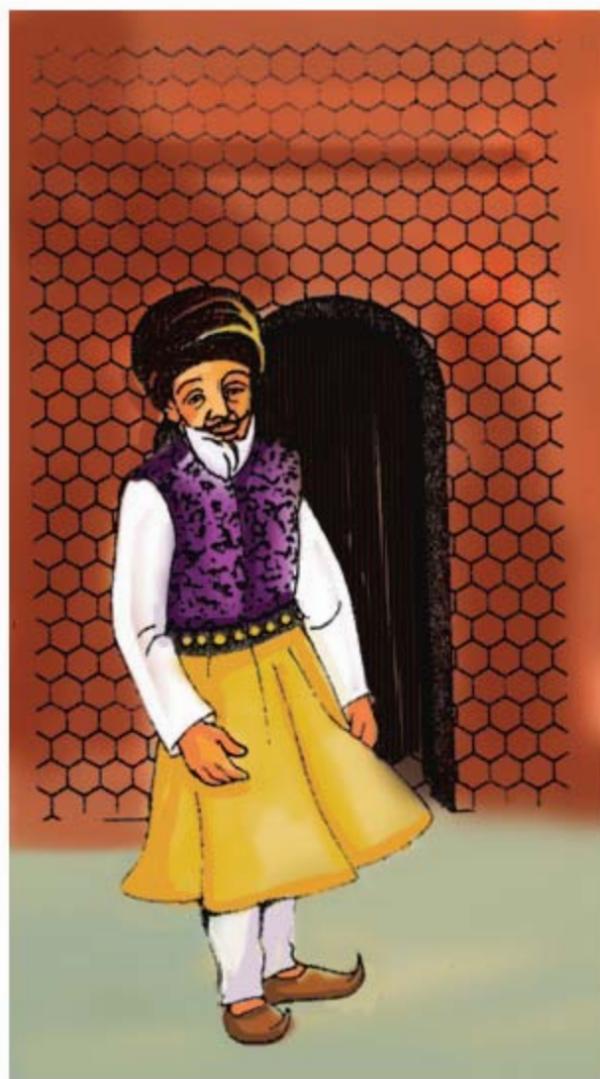
বাদশাহ শুধালে শাজের কথা শুনাব অনর্গল ।

যাই যাবে প্রাণ তাহে,
প্রাপ্তের চেয়েও মান বড়, আমি শুনাৰ শাহানশাহে।

তাৰ পৱিত্ৰ প্ৰাতে
বাদশাহৰ দৃঢ় শিক্ষকে ডেকে নিৱে গোল কেন্দ্ৰাতে।
খাস কামৰাতে যবে
শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, ‘শুনুন জনাৰ তবে,
পুত্ৰ আমাৰ আপনাৰ কাছে
সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?’
বৰৎ শিখেছে বেয়াদবি আৰ পুৰুজনে অবহেলা,
নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা অৱৎ সকাল বেলা।’

শিক্ষকে কল—‘জাহাপনা, আমি বুঝিতে পারিনি, হায়,
কী কথা বলিতে আজিকে আমাৰ ডেকেছেন নিৱালাম?’
বাদশাহ কহেন, ‘সে দিন প্ৰভাতে
দেখিলাম আমি দাঁড়াৰে তফাতে
নিজ হাতে যবে চৱণ আপনি কৱেন প্ৰকালন,
পুত্ৰ আমাৰ জল ঢালি শুধু ভিজাইছে ও চৱণ।
নিজ হাতখানি আপনাৰ পামে বুলাইয়া সবতনে
ধূয়ে দিল নাক কেল সে চৱণ, বড় ব্যথা পাই যনে।’

উচ্ছ্঵াস ভৱি শিক্ষকে আজি দাঁড়াৱে সংগীৱবে,
কুৰ্বিশ কৱি বাদশাহে তবে কহেন উচ্চৱবে—
‘আজ হতে চিৰ উন্নত হলো শিক্ষাগুৰুৰ শিৰ
সত্যাই তুমি যহান উদাহৰ বাদশাহ আলমগীৰ।’



অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

‘শিক্ষাগুরুর মর্যাদা’ কবিতায় শিক্ষকের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কবিতায় শিক্ষক একজন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহ আলমগীরের ছেলের দ্বারা পায়ে পানি ঢেলে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাদশাহ আলমগীর এতে সত্ত্বষ্ট ছিলেন না। বাদশাহ আলমগীর প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর সন্তান পানি ঢেলে নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধূয়ে দেবেন। তবেই না তাঁর সন্তান নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম নিয়ে দেশের একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। বাদশাহ আলমগীর উপলব্ধি করেছিলেন, যে ছাত্র তাঁর শিক্ষককে যথাযথ মর্যাদা দিতে জানে না, শিক্ষকের সেবা করতে জানে না, সে কখনো পরিবার, সমাজ ও দেশের উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না।

শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কবিতার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শিক্ষা হলো একটি জাতির মেরুদণ্ড, আর শিক্ষক হলেন কাঞ্চারি। তিল তিল করে নীরবে নিভৃতে শিক্ষক তাঁর আদর্শ দ্বারা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার উপযোগী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলেন। সমাজ ও দেশের জন্য শিক্ষকের অবদান অপরিসীম। তাই সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কুমার শাহজাদা বারি চরণ শির শাহানশাহ প্রক্ষালন কুর্নিশ

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কুমার	বারি	চরণ	শির	শাহানশাহ	কুর্নিশ
-------	------	-----	-----	----------	---------

- ক. পিতার হাত রেখে পুত্র দোয়া চাইল।
- খ. বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণ হয়।
- গ. আগের দিনে হাতি - ঘোড়া চড়ে শিকারে যেতেন।
- ঘ. উজির বাদশাহকে করলেন।
- ঙ. আলমগীর ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ শাসক।
- চ. অন্যায়ের কাছে কখনো নত করব না।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

- ক. বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে কে পড়াতেন?
- খ. একদিন সকালে বাদশাহ কী দেখতে পেলেন?
- গ. বাদশাহকে দেখে শিক্ষক প্রথমে কী ভাবলেন?
- ঘ. ‘প্রাণের চেয়েও মান বড়’— শিক্ষক এ কথা বললেন কেন?

- ঙ. বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে প্রথমে কী বললেন?
 চ. শিক্ষক কী বলে বাদশাহর সুনাম করলেন?

৫. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

শিক্ষকে ডাকি বাদশাহ কহেন, ‘শুনুন জনাব তবে,
 পুত্র আমার আপনার কাছে
 সৌজন্য কি কিছু শিখিয়াছে?’

বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা,
 নহিলে সেদিন দেখিলাম যাহা স্বয়ং সকাল বেলা।’

৬. ক্ষ, ষ্ঠ, ষ্ম, ষ্ট্র— প্রত্যেকটি যুক্তবর্ণ ব্যবহার করে তিনটি করে শব্দ লিখি। যেমন—

ক্ষ =	ক + ষ	—	ক্ষয়, শিক্ষা, সক্ষম
ষ্ঠ =	স্ + ব	—	
ষ্ম =	স্ + ম	—	
ষ্ট্র =	স্ + ত্ + র	—	

৭. বিপরীত শব্দগুলো ঠিকমতো সাজাই।

বড়	অপযশ
মান	অবনত
যশ	বিকাল
বিষাদ	অপমান
উন্নত	ছোট
সকাল	হৰ্ষ

কবি-পরিচিতি



কাজী কাদের
নওয়াজ

কবি কাজী কাদের নওয়াজ ১৯০৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও বিটি পাশ করেন। তিনি চাকরি জীবনের প্রথমে ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর, পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নীতিকথা ও কাহিনিমূলক শিশুতোষ কবিতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৮৩ সালের ওরা জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভাবুক ছেলেটি

দশ-এগোরো বছরের ছেলেটি তেমন দুরস্ত নয়। পড়াশোনায় সে ভালো, খেলাধূলাও করে। তবে সময় পেলেই গাছ-গাছালি পর্যবেক্ষণ করে। রোদ-বৃক্ষের ব্যাপারটাও দেখে সে। আকাশে মেঘ ডাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। বাজ পড়ে। কেন এমন হয়? অবাক বিশ্বায়ে ভাবে সে। বাড়ে গাছপালা ভেঙ্গে গেলে বাবাকে প্রশ্ন করে।

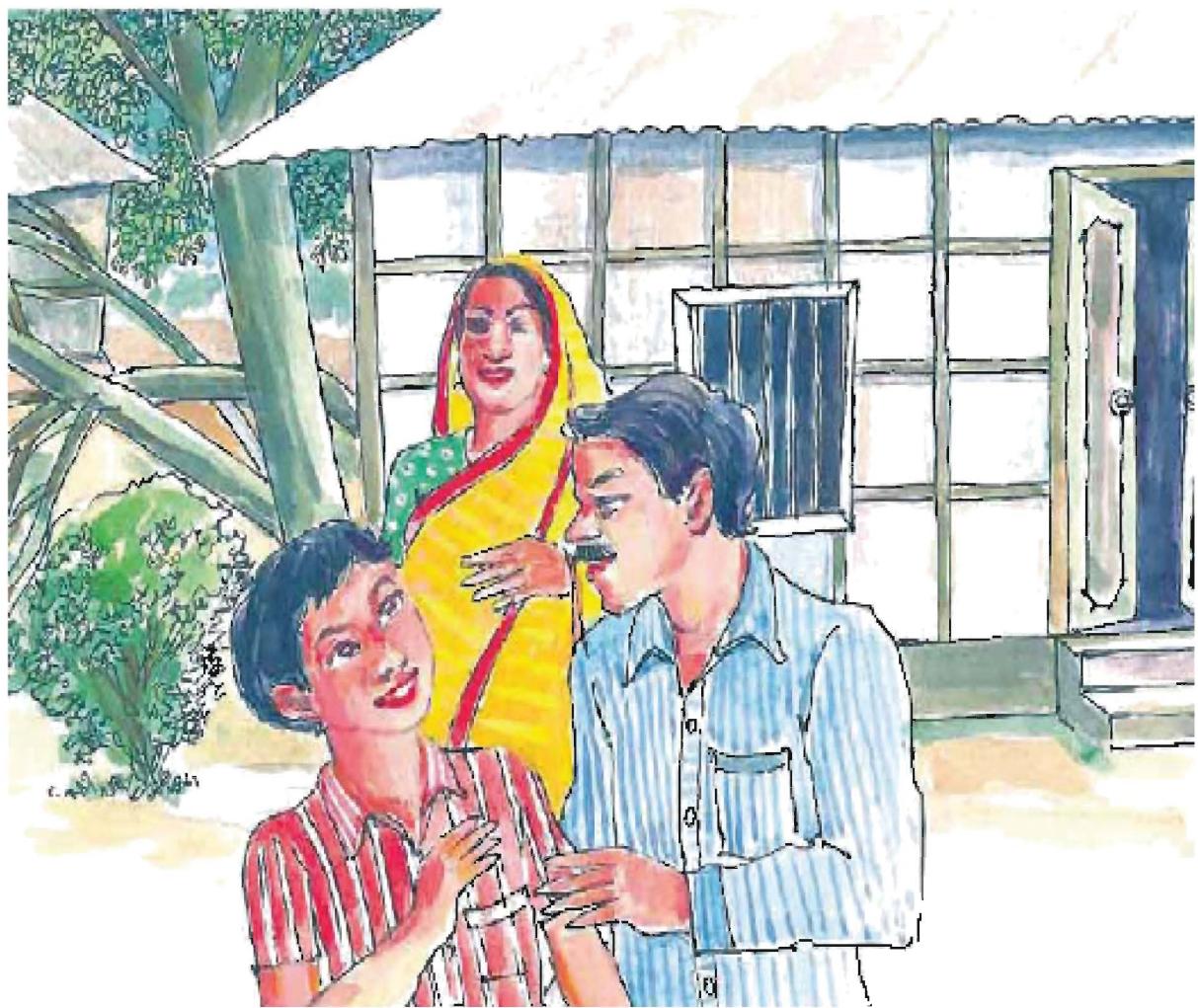
– আচ্ছা বাবা, গাছ ভেঙ্গে গেলে, ওদেরকে কাটলে ব্যথা পায় না?

ছেলের কথা শুনে মা হাসেন। বাবা কিন্তু হাসলেও ছেলের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওর বাবা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আগে স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন।

ছেলেটির বাবার বাড়ি বিক্রমপুরের রাট্তিখাল গ্রামে। তবে তার জন্ম ময়মনসিংহে। ১৮৫৮ সালের ত্রিশে নভেম্বর। ওর পড়াশোনায় হাতেখাড়ি হয়েছিল বাড়িতেই। তারপর ময়মনসিংহে স্কুল শিক্ষার ধাপ শেষ করে সে ভর্তি হয় কল্কাতায়। স্টেট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে ১৮৭৪ সালে সে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে। কৃতিত্বের ধারায় সে ১৮৭৮ সালে এফএ পাস করে। তারপর ১৮৮০ সালে বিজ্ঞান শাখায় বিএস পাস করে বিলেতে যায় ডাক্তারি পড়তে।

সেই ছেলেটিই বড় হয়ে প্রথম বাঙালি বৈজ্ঞানিক হিসেবে জগৎ জোড়া খ্যাতি অর্জন করে। তোমরা অনেকেই হয়তো বুঝতে পেরেছ কে তিনি? হ্যাঁ, সেদিনকার সেই ভাবুক ছেলেটিই পরবর্তীকালের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।





জগদীশচন্দ্ৰ এক বছৰ ডাক্তাৱি পড়াৰ পৱ ১৮৮১ সালে ইংল্যান্ডেৰ কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। এখান থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ কৱেন তিনি। ১৮৮৫ সালে দেশে ফিৱে এসে কলকাতায় প্ৰেসিডেন্সি কলেজে পদাৰ্থবিজ্ঞানেৰ অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তখন দেশ ছিল পৱাধীন। এ সময় একই পদে একজন ইংৰেজ অধ্যাপক যে বেতন পেতেন ভাৱতীয়ৱা পেতেন তাৱ তিনি ভাগেৱ দুই ভাগ। জগদীশচন্দ্ৰ অস্থায়ীভাৱে চাকৱি কৱছিলেন বলে তাঁৱ বেতন আৱও এক ভাগ কেটে নেওয়া হয়। এৱ প্ৰতিবাদে তিনি দীৰ্ঘ তিন বছৰ বেতন না নিয়ে কৰ্তব্য পালন কৱেন। শেষ পৰ্যন্ত ইংৰেজ সৱকাৱ তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। সকল বকেয়া পৱিশোধ কৱে চাকৱিতে স্থায়ী কৱে তাঁকে। তখন থেকেই তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্ৰ বসু হয়ে ওঠেন। লঙ্ঘন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্ৰি প্ৰদান কৱে।

জগদীশচন্দ্র বসু নানা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তবে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন গাছেরও প্রাণ আছে- এই সত্য প্রমাণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন। কোনো তার ছাড়া তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সফলতা অর্জন করেন। তারই প্রয়োগ ঘটেছে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান-প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।

মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে করা পরীক্ষণগুলো ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমকে দেয়। তাঁর পার্সিপুর্ণ বক্তৃতা শুনে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড কেলভিন বিলেতেই অধ্যাপনা করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।

তাঁর আশ্চর্য সব আবিষ্কার দেখে সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন: জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।

জগদীশচন্দ্র বাংলাতেও বেশ লিখেছেন, বিশেষ করে তোমাদের মতো শিশুদের জন্য। তাঁর লেখা ‘নিরুদ্ধেশের কাহিনী’ বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি। এটি পরে ‘পলাতক তুফান’ নামে জগদীশচন্দ্রের ‘অব্যক্ত’ নামক বইয়ে ছাপা হয়। তাঁর লেখা ‘অদ্যুৎ আলোক তোমাদের আনন্দ দেবে।

১৯১৫ সালে ব্রিটিশ-ভারত সরকার তাঁকে ‘নাইট উপাধি’ দেন। তাই তাঁর উপাধিসহ নাম হয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। ১৯১৬ সালে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর দুই বছর পর প্রতিষ্ঠা করেন জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেই বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা পরিচালনা করেন। বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতা বিজ্ঞানী গ্যালিলিও-নিউটনের সমকক্ষ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে ১৯৩৫ সালে। জগদীশচন্দ্র বসু ভারতের গিরিডিতে মারা যান ১৯৩৭ সালের তেইশে নতুন পথে।

ওই সময়ের সেই ভাবুক ছেলেটিই স্যার জগদীশচন্দ্র বসু একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি বাঙালির গৌরব। সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। পৃথিবীকে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের নতুন পথ।



জগদীশচন্দ্র বসু

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পর্যবেক্ষণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিজয়স্তম্ভ গিরিডি কল্পকাহিনি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি
প্রবেশিকা এফএ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বিজয়স্তম্ভ	কল্পকাহিনি	আবিষ্কার	কল্যাণ	পাণ্ডিত্যপূর্ণ	দুরস্ত
পদাৰ্থবিজ্ঞানের	বিশ্বে	বাড়িতে	অতিক্ষুদ্র	কৰ্তব্য	প্রাণী জীবনের

- ক. তাঁর বস্তুতা শুনে তাঁকে অধ্যাপনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়।
- খ. দেশের করার জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।
- গ. জগদীশচন্দ্ৰ বসুৰ আশৰ্চ্য সব দেখে আইনস্টাইন মৃগ হয়ে গিয়েছিলেন।
- ঘ. জগদীশচন্দ্ৰ বসুৰ প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি।
- ঙ. জগদীশচন্দ্ৰ বসুৰ ‘নিরুদ্দেশের কাহিনি’ বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বৈজ্ঞানিক।
- চ. ছেলেটি তেমন নয়।
- ছ. মেঘ ডেকে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে বাজ পড়লে অবাক ভাবে।
- জ. ওৱ পড়াশোনার শুরু।
- ঝ. প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক পদে যোগ দেন।
- ঝ. প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছৰ বেতন না নিয়ে পালন কৱেন।
- ট. তিনি দেখিয়েছিলেন যে, উঙ্কিদ ও মধ্যে অনেক মিল আছে।
- ঠ. তিনি তরঙ্গসূষ্টি আবিষ্কার কৱেন।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বর্ণি।

- ক. ভাবুক ছেলেটি আসলে কে ছিলেন ?
- খ. তিনি ছোটবেলায় কী কী নিয়ে ভাবতেন ?
- গ. তিনি কবে, কোথা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ?
- ঘ. কখন থেকে তিনি ‘বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু’ হয়ে ওঠেন ?
- ঙ. কোন সত্য প্রমাণ করে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন ?
- চ. তাঁর বক্তৃতার সফলতা সবচেয়ে বেশি ছিল কোন বিষয়ে ?
- ছ. বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সফলতাকে কোন নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে
তুলনা করা হয়েছে ?
- জ. ‘পলাতক তুফান’ নামে লেখাটির আগে কী নাম ছিল ? তাঁর কোন বইয়ে এটি ছাপা হয় ?
- ঝ. অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন ?
- ঝঃ. ‘তাঁর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।’ এমন কথা কোন
বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন ? কেন বলেছিলেন ?

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) টিক দিই।

- ক. কোন সত্যটি প্রমাণ করে জগদীশচন্দ্র বসু বেশি পরিচিতি লাভ করেন ?

১. গাছের প্রাণ আছে

২. অতিক্রূদ্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি করে

৩. মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে

৪. বেতার এবং টেলিভিশন আবিষ্কারের মাধ্যমে

- খ. জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে
যোগদান করেন ?

১. বাংলা

২. পদার্থবিজ্ঞান

৩. ইংরেজি

৪. গণিত

- গ. জগদীশচন্দ্র বসু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

১. ময়মনসিংহ

২. ঢাকা

৩. কুমিল্লা

৪. ফরিদপুর

- ঘ. ‘জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ’ কথাটি
কে বলেছিলেন ?

১. বিজ্ঞানী অলিভার লজ

২. বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন

৩. বিজ্ঞানী আইনস্টাইন

৪. বিজ্ঞানী গ্যালিলিও

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

- শিক্ষার ধাপ পার - প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষা হলো একটার পর একটা শিক্ষার ধাপ।
- বকেয়া পরিশোধ - কারো নিকট কোনো টাকা-পয়সা পাওনা থাকলে যদি সময়মতো দেওয়া না হয় তখন তা বকেয়া হয়ে যায়। পরে যদি আগের পাওনা দিয়ে দেওয়া হয় তবে তাকে বলে বকেয়া পরিশোধ।
- অন্যতম - বহুর মধ্যে এক হলে তাকে বলা হয় অন্যতম। কোনো কিছুকে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য ‘অন্যতম’ শব্দটি ব্যবহার করা যায়।
- তথ্যের আদান-প্রদান - তথ্য বলতে ঠিক সংবাদ, প্রকৃত অবস্থা বা সত্যকে বোঝাতো। কিন্তু আজকের দিনে লিখে, ছাপিয়ে অথবা বেতার, টেলিভিশন, ফোন, ইন্টারনেটের সাহায্যে যত রকম কিছু পাওয়া যায়, পাঠানো যায় তার সবই তথ্যের আদান-প্রদান।
- নাইট উপাধি - নাইট উপাধি ব্রিটিশরাজের অত্যন্ত সন্মানজনক উপাধি। এঁদেরকে ‘স্যার’ বলে সম্মৌখন করা হয়।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

‘বিজ্ঞান শিক্ষাই সভ্যতা বিনির্মাণের একমাত্র হাতিয়ার’ – বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

৭. আমার জানা যেকোনো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে ২০টি বাক্য লিখি।

দুই তীরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

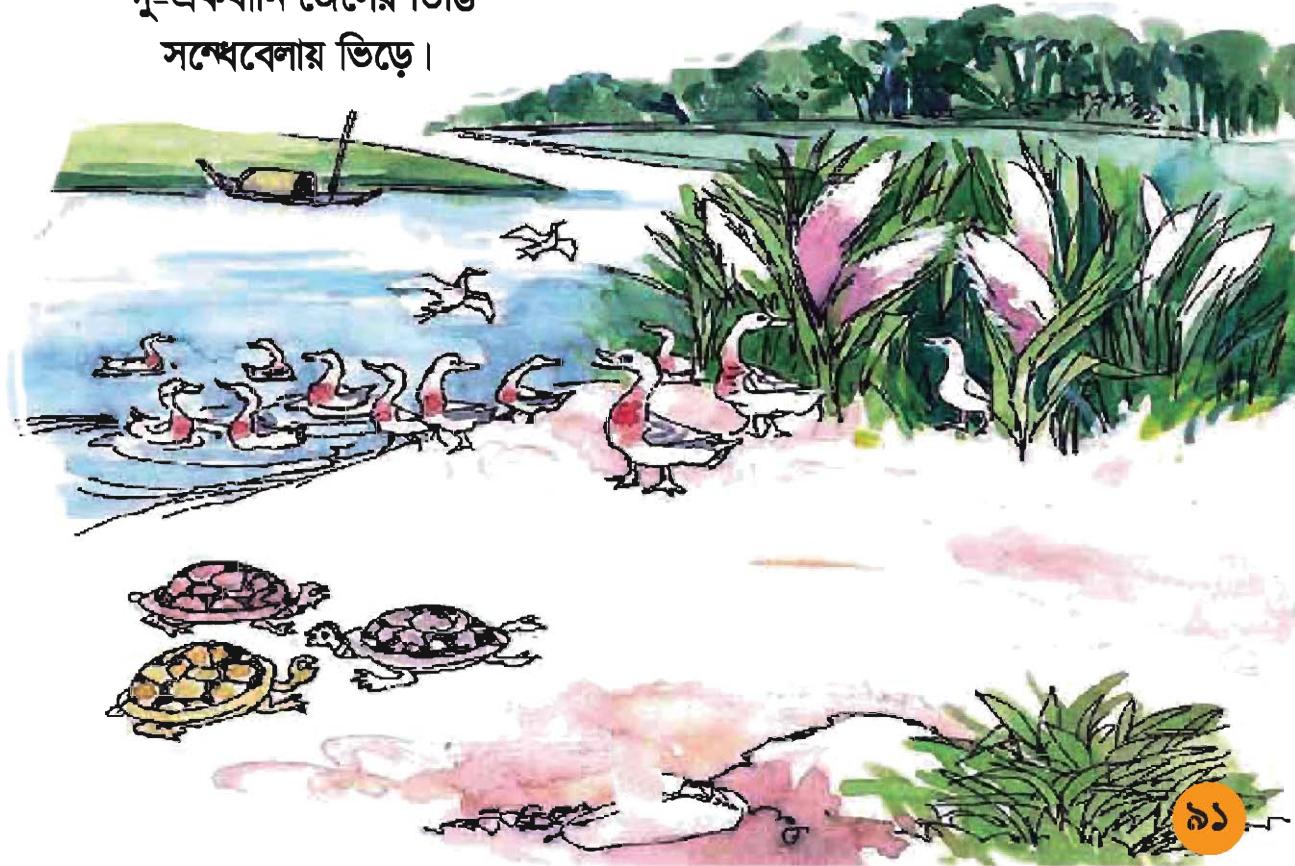
আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।

যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারি পাশ,
শীতের দিনে বিদেশি সব
হাঁসের বসবাস।

কচ্ছপেরা ধীরে
রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু-একখানি জেলের ডিঙি
সম্মেবেলায় ভিড়ে।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেথায় গাঁথা ঘনছায়া
পাতার আচ্ছাদন।

যেথায় বাঁকা গলি
নদীতে যায় চলি,
দুই ধারে তার বেণুবনের
শাখায় গলাগলি।



সকাল-সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে ভাসায় ভেলা।

(সংক্ষেপিত)



অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

একটি নদী, তার দুই তীরে দু-জন মানুষ বাস করে। একজন ভালোবাসে তার নদীর বালুচর, শরৎকালে চকাচকিরা যেখানে ঘর বাঁধে। এর তীরে তীরে ফুটে থাকে কাশফুল। শীতের সময় হাঁসেরা এসে ভিড় করে, কচ্ছপ রোদ পোহায়। সন্ধ্যায় জেলের ডিঙি এসে ভেড়ে। অন্যজন ভালোবাসে বন, যার আছে ঘন ছায়া। সেখান থেকে একটা রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। নদীর ঘাটে বধূরা আসে, ছেলেরা জলে ভেলা ভাসায়। একটি নদী দুই তীরের মানুষকে কী সুন্দর মিলিয়ে দিয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নির্জন চকাচকি তট ডিঙি আচ্ছাদন বেণুবন

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

চকাচকিরা

আচ্ছাদন

তটে

বেণুবন

নির্জন

ডিঙি

ক. এলাকাটি এত যে গা ছমছম করে।

খ. নদীর ধারে দল বেঁধে উড়ে বেড়ায়।

গ. গ্রামের ছোট ছোট নদীগুলো দিয়ে মানুষ করে নদী পারাপার হয়।

ঘ. নদীর দু প্রতিবছর মেলা বসে।

ঙ. নদীর তীরে বটগাছটি বর্ষাকালে মানুষ হিসাবে ব্যবহার করে।

চ. নদীর ধারে গজিয়ে ওঠা বাতাসে দুলতে থাকে।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

তুমি ভালোবাস তোমার
ওই ও পারের বন,
যেখায় গাঁথা ঘনচ্ছায়া
পাতার আচ্ছাদন।



৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

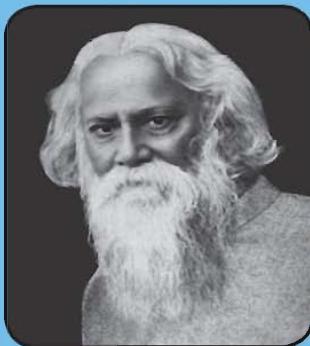
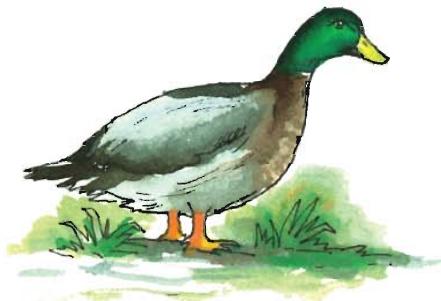
- ক. নদীর বালুচরে কী ঘটে?
- খ. দুই তীরে দু-জন মানুষের ভালো লাগার জিনিসগুলো কী?
- গ. ঘাটে বধূর মেলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- ঘ. দুই তীরে কবিতায় ওই পারের বনটি কেমন?
- ঙ. সকাল-সন্ধেবেলা ছেলের দল কী করে?

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

শূন্যস্থানে কথা বসিয়ে একটি কবিতা বা ছড়া লেখার চেষ্টা করি।

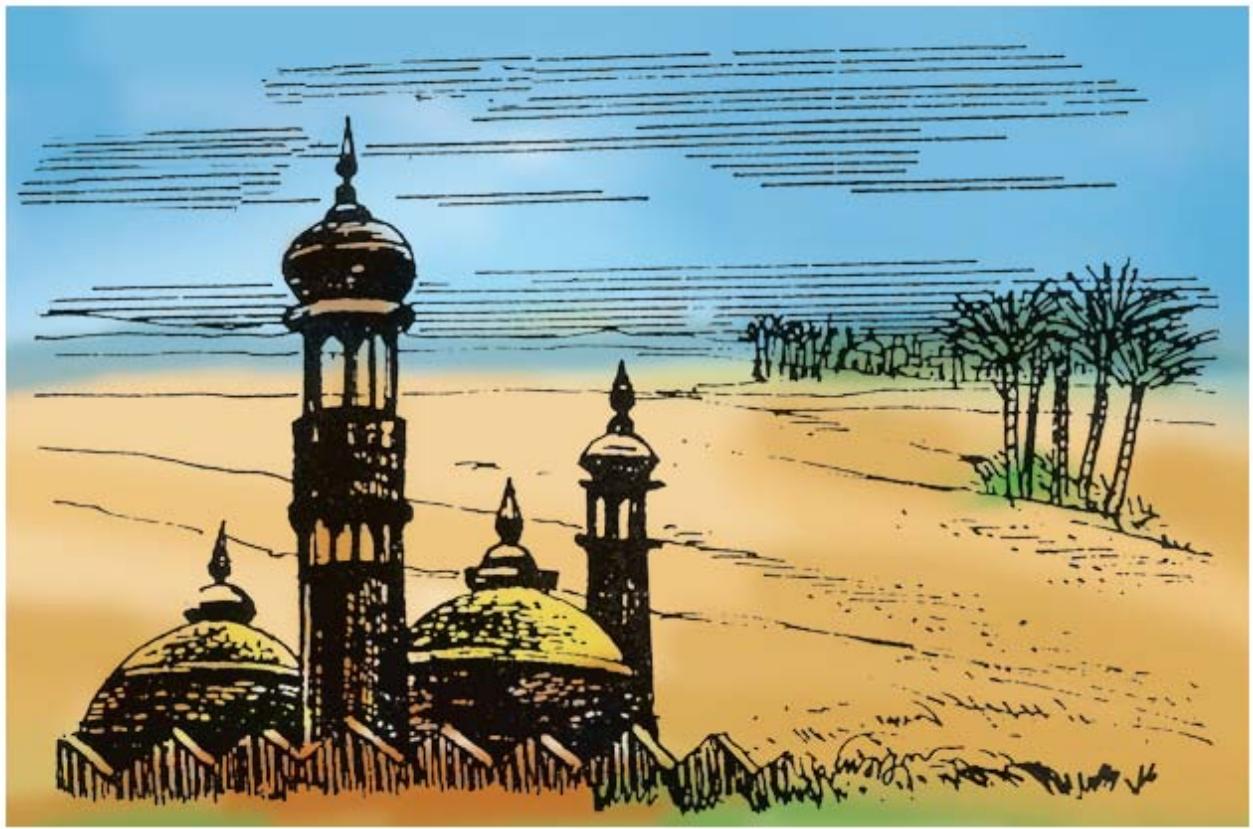
..... মাস,
..... বাঁশ।
..... চর,
..... ঘর।
..... মন,
..... বন।



কবি-পরিচিতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বাঞ্ছা সনের ২৫শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরন্দর্শক, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনাভাঙ্গার বিশাল। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট, ১৩৪৮ বাঞ্ছা সনের ২২শে শ্বাবণ, তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিদায় হজ

দশম হিজরি। আরবদেশের অনেকেই তখন ইসলাম ধর্ম প্রচল করেছেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন সত্য, ন্যায় ও মানবতার বাণী। ইসলামের এ বাণী তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

দশম হিজরির হজের সময় এসে গেল। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) অন্তরের গভীরে কাবার আহ্বান অনুভব করলেন। তিনি স্থির করলেন সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে হজ পালন করবেন। এই সংবাদ চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

যিলকাদ মাস। নবিজির (স) কাছে সমবেত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের ইচ্ছা নবিজির (স) সঙ্গে হজ পালন করবেন। যিলকাদ মাসের শেষ দিকে মহানবির (স) সঙ্গে তাঁরা মক্কার পথে যাত্রা করলেন। যাঁরা তাঁকে কখনও দেখেননি তাঁরাও এই মহামানবকে একবার দেখার জন্য কাবাশরিক্ষে এলেন।

আরব দেশের নানা স্থান থেকে সেবার প্রায় দুই লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসেন। আরাফাতের ময়দানে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে মহানবির (স) মন আনন্দে ভরে গেল। এত মানুষ! এরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। জাবালে রাহমাত নামক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। হজ উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে নবিজির (স) এটিই শেষ ভাষণ। আর তাই এটি বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। মানবজাতি চিরদিন তাঁর এই ভাষণকে গভীর শৃদ্ধায় আরণ করবে।

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর সমবেত মানুষের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন:

তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। আজকের এই দিন তোমাদের কাছে পবিত্র। এ মাসটিও তেমনি তোমাদের কাছে পবিত্র। তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি তোমাদের পরম্পরের কাছে পবিত্র।

মনে রেখ, একদিন তোমরা আল্লাহর কাছে হাজির হবে। পৃথিবীতে তোমরা যে কাজ করেছ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব চাহিবেন।

তোমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরাও আল্লাহর বান্দা। তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কর না। তোমরা নিজেরা যা খাবে, তাদেরও তাই খেতে দেবে। নিজেরা যে কাপড় পরবে, তাদেরও তাই পরতে দেবে।

কোনো ক্রীতদাস যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে। তখন বংশ-মর্যাদার কথা বলবে না।

মনে রেখ, সব মুসলমান একে অন্যের ভাই। তোমরা এক ভাই কখনও অন্য ভাইয়ের সম্পত্তি জোর করে দখল কর না।

কখনো অন্যায় এবং অবিচার কর না। সামান্য পাপ থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

আজ যারা এখানে আসেনি, আমার উপদেশ তাদের কাছে পৌছে দিও। হয়ত এই উপদেশ তারা বেশি করে মনে রাখবে।

মানুষ নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ী থাকবে। একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা চলবে না।

মহানবি জোর দিয়ে বললেন :

ধর্ম নিয়ে বাঢ়াবাঢ়ি করবে না। নিজের ধর্ম পালন করবে। যারা অন্য ধর্ম পালন করে, তাদের ওপর তোমরা ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর না।

মহানবি (স) চারটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন। এই চারটি কথা হলো :

- আশ্রাহ ছাড়া অন্য কারণে উপাসনা কর না।
- অন্যান্যভাবে মানুষকে হত্যা কর না।
- পরের সম্পদ অপহরণ কর না।
- কারণ ওপর অভ্যাচার কর না।

মহানবি হ্যবত মুহাম্মদ (স) আরও বললেন :

তোমাদের কাছে আমি দুটি জিনিস ক্ষেত্রে ঘাঁটি।

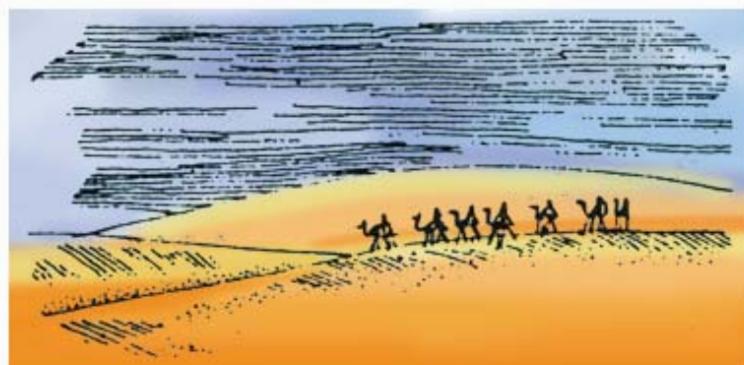
এক. আশ্রাহ বাণী অর্থাৎ কুরআন।

দুই. আশ্রাহ প্রেরিত পুরুষ মাসুলের জীবনের আদর্শ। এই দুটি তোমাদের পথ দেখাবে।

মহানবি (স) তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। তাঁর তোধ্যুক্ত আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ‘হে আশ্রাহ, আমি কি তোমার বাণী মানুষের কাছে পৌছে দিতে পেরেছি?’

আরাফাতের যমদান থেকে লক্ষ লক্ষ কর্তৃ ধনিত হল, ‘হ্যা, আপনি পেরেছেন।’

মহানবি হ্যবত মুহাম্মদ (স)- এর মন কখন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। পৃথিবীতে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। তাঁর মনে হলো, হ্যত এটাই তাঁর জীবনের শেষ হচ্ছ। হ্যত তিনি আর কাবাশরিফে উপস্থিত হতে পারবেন না। সমবেত মানুষের উদ্দেশে তিনি বললেন, ‘তোমরা সাক্ষী, আমি কর্তব্য পালন করেছি। বিদায়।’



ଅନୁଶୀଳନୀ

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।
হিজরি হজ মহানবি কাবাশরিফ আরাফাত ভাষণ বান্দা আমির
উপাসনা ক্রীতদাস যিলকাদ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আরাফাত **ক্রীতদাস** **কাবাশরিফ** **মহানবি** **হিজরি** **হজ**

- ক. দশম হজের সময় এসে গোল।

খ. তাঁদের ইচ্ছা নবিজির (স) সঙ্গে পালন করবেন।

গ. হ্যারত মুহাম্মদ (স) প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

ঘ. যাঁরা তাঁকে কখনও দেখেননি তাঁরাও এই মহামানবকে একবার দেখার জন্য
এলেন।

ঙ. ময়দান থেকে লক্ষ লক্ষ কঠে ধ্বনিত হল, ‘হ্যাঁ, আপনি পেরেছেন।’

চ. কোনো যদি নিজের যোগ্যতায় আমির হয়, তবে তাকে মেনে চলবে।

- ### ৩. প্রশ়ঙ্গুলোর উভয় বলি ও লিখি।

- ক. হিজরি কোন সালে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয়?

খ. আরাফাত-ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে নবিজির (স) মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

গ. মহানবি (স) তাঁর ভাষণে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী সম্পর্কে কী বলেছেন?

ঘ. ধর্ম সম্পর্কে মহানবি (স) কী উপদেশ দিয়েছেন?

ঙ. কোন চারটি কথা নবিজি (স) বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছেন?

চ. তিনি আমাদের কাছে কোন দুইটি জিনিস রেখে গেছেন?

৪. ঠিক উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

- ক. বিদায় হজ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

 ১. মদিনায়
 ২. মক্কায়
 ৩. আরাফাতের ময়দানে
 ৪. জেদায়

- খ. আরাফাতের ময়দানে কত লক্ষ মানুষ হজ পালন করতে আসেন?
১. প্রায় এক লক্ষ
 ২. প্রায় দুই লক্ষ
 ৩. প্রায় তিন লক্ষ
 ৪. প্রায় চার লক্ষ
- গ. হ্যরত মুহাম্মদ (স) কাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে নিষেধ করেছেন?
১. সৈন্যদের
 ২. সাহাবিদের
 ৩. আলেমদের
 ৪. ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের
- ঘ. মহানবি (স) কয়টি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে বললেন?
১. দুইটি
 ২. চারটি
 ৩. ছয়টি
 ৪. আটটি
- ঙ. মহানবির (স) ঢোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কেন?
১. মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দেওয়ার জন্য
 ২. মক্কা জয়ের আনন্দে
 ৩. সাহাবিদের নিয়ে হজ পালন করতে পারায়
 ৪. বিদায় হজের ভাষণে বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে

৫. নিচের বাক্যগুলো এককথায় প্রকাশ করি।

- | | | |
|-----------------------|---|-----------|
| যার তুলনা হয় না | — | অতুলনীয় |
| যার শত্রু জন্মায়নি | — | অজাতশত্রু |
| আকাশে যে উড়ে বেড়ায় | — | খেচর |
| বিদেশে থাকে যে | — | প্রবাসী |
| যা কষ্টে লাভ করা যায় | — | দুর্লভ |
| যা জলে চরে | — | জলচর |

৬. বিরামচিহ্নগুলো চিনে নিই।

বিরামচিহ্নের নাম	চিহ্নের আকৃতি
কমা	,
সেমিকোলন	;
দঁড়ি	
জিজ্ঞাসা-চিহ্ন	?
বিশ্বয়-চিহ্ন	!

বাক্যের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা শেষে আমরা বিরামচিহ্ন ব্যবহার করি। নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও এই চিহ্নের জায়গায় আমরা থামি।

এবার নিচের বাক্যগুলো পড়ি এবং ঠিক জায়গায় বিরামচিহ্ন বসাই :

এত বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে নবিজির (স) মন আনন্দে ভরে গেল এত মানুষ এরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে তাঁর মনে হলো হয়ত এটাই তাঁর জীবনের শেষ হজ।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

‘বিদায় হজ’ গল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো লিখি।

দেখে এলাম নায়াগ্রা

তোমরা নিশ্চয়ই জলপ্রপাতের কথা শুনেছ? জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য একবার আমার হয়েছিল। নিজের দেশে নয়, বিদেশের মাটিতে। কানাডায় গিয়েছি। সেখানকার খুব বড় শহর টরন্টোতে। একদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পের মজলিসে কথা উঠল- সবাই মিলে নায়াগ্রা দেখতে গেলে কেমন হয়। তখনি সকলে রাজি। কোনদিন যাওয়া হবে তাও ঠিক হলো।

কোথাও যাব বললেই তো হয় না, কীভাবে যাব তা ভাবতে হয়। বাসে করে যাওয়া যায়। কিন্তু বাসে চেপে গেলে নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে থামা যায় না। অতএব ঠিক হলো যে, কোনো বন্ধুর একটা গাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে।



তাই যাওয়া গেল একদিন। আমেরিকায় কিংবা কানাডায় প্রায় সকলেরই নিজের গাড়ি থাকে। আমার বন্ধুরও ছিল। বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম। চলো নায়াগ্রা, চলো নায়াগ্রা। আহ, দেশে ফিরে গিয়ে কী গল্পটাই না করা যাবে!

শীঁ শীঁ করে গাড়ি ছুটতে লাগল। এখানে রাস্তা মোটেই আঁকাবাঁকা থাকে না, রেললাইনের মতো সোজা। ফলে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়।



কিন্তু এত জায়গা থাকতে নায়াটা দেখতেই যেতে হবে কেন? নায়াটা হলো জলপ্রপাত। জলপ্রপাত তো কখনো দেখিনি। শুধু জেনে এসেছি, বার্ণার মতো পাহাড়ের ওপর থেকে পানি নিচে সমতল ভূমিতে গড়িয়ে পড়ে। তবে আকারে অনেক বিশাল। বার্ণা ছোট, আর জলপ্রপাত বড়— এটুকু যা তফাত। উপর থেকে নিচে জল পতনের ব্যাপার দুই জায়গাতেই ঘটছে। জল যদি না-ই পড়ে, তা হলে বার্ণাও হবে না, জলপ্রপাতও হবে না। কিন্তু জল যে নিচে পড়ছে, পড়ে যাচ্ছে কোথায়? জলের ধর্ম তো গড়িয়ে যাওয়া। বার্ণার জলও গড়াতে গড়াতে ক্রমশ নদী হয়ে যায়।

এখন অন্য কথায় আসি। জলপ্রপাত দেখতে যাব, কিন্তু পাহাড় দেখব না— একি কখনো সম্ভব? সম্ভব নয়। কারণ পাহাড় বেয়ে জলের নিচে নামাটা না দেখে উপায় তো নেই।

কিন্তু বিশ্ব-ভূমঙ্গল বড়ই বিচ্ছিন্ন! কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রামে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি।

সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্ত্রোতা নদী বইছে। সামনের সবকিছু তো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কই? কিছুই তো ভাসছে না! তার কারণ, যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্ত্রোতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাতে করেই এক বিশাল ফাটল। দুই দিকের মাটির মধ্যে এক বিরাট ফাঁক। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ফাঁক। নায়াগ্রাম জল ঐ ফাঁকের ভিতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রপাত, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে, সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। কিন্তু পানিটা ফাটলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কোথায়?

নায়াগ্রাম তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুজে বের করি। অর্থ বলি।

কানাডা দ্রুতগতিতে পতন সমতল ভূমি প্রবাহিত হওয়া গহ্বর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কানাডা দ্রুতগতিতে পতন সমতল ভূমিতে প্রবাহিত গহ্বর

ক. হোঁচট খেলে ঠেকানো দায়।

খ. নদীর জল হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়।

গ. পাহাড়ের গায়ে গর্ত থাকলে তাকে আমরা বলি।

ঘ. আমরা হাঁটতে পারি।

ঙ. একটি বড় দেশ।

চ. ঢাকা শহর গড়ে উঠেছে, কিন্তু চট্টগ্রাম শহর সে রকম নয়।

৩. প্রশ়ঙ্গুলোর উভয় লিখি ও বলি।

- ক. নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত ?
 - খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ ?
 - গ. নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিশেষত্ব কী ?
 - ঘ. নায়াগ্রার জল কোথায় যায় ?
 - ঙ. ‘বিশ্ব-ভূমঙ্গল বড়ই বিচ্চি’- ব্যাখ্যা কর ।
 - চ. সাধারণ জলপ্রপাতের সঙ্গে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তুলনামূলক আলোচনা কর ।

৪. ঠিক উন্নতিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

- ## ক. নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?



- ## খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত পড়চে-

- গ. জলপ্রপাত দেখতে বাসে না যাবার কারণ কী?

৫. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

- ক. তখন আমিও পড়েছি জলপ্রপাতের কথা।

সৌভাগ্য

- খ. জলপ্রপাত দেখার একবার হয়েছিল।

ফাটল

- গ. একদিন সঙ্গে গল্পের মজলিসে কথা উঠলো।

খনজ্ঞতা

- ঘ. যে মাটির ওপর দিয়ে এই নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে

ନାୟାଗ୍ରା

সেখানে হঠাৎ করেই এক বিশাল.....।

ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଦେର

৬. কথাগুলো বুঝে নিই।

- | | |
|---------------|---|
| জলপ্রপাত | - পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে সমতল ভূমিতে বিশাল পরিধি নিয়ে জল পড়া। |
| মজলিস | - গল্পগুজব করার আসর। |
| জলের ধর্ম | - জলের স্বভাব, জলের চরিত্র। |
| বিশ্ব-ভূমণ্ডল | - জগৎ, দুনিয়া। |

৭. কর্ম-অনুশীলন।

আমি কোথায় কোথায় বেড়াতে বা ঘুরতে গিয়েছি- তা মনে করার চেষ্টা করি। এর মধ্য থেকে যেকোনো একটি জায়গার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি লিখি (কোথায় গিয়েছিলাম, কবে গিয়েছিলাম, কীভাবে গিয়েছিলাম, কী কী দেখেছিলাম, কী করেছিলাম, কী খেয়েছিলাম, কেমন করে ফিরে এসেছিলাম)।

৮. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি।

বিশ্ব-ভূমণ্ডল বড়ই বিচ্ছিন্ন। কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রামে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। সমতলের ওপর দিয়ে একটি খরস্নেতা নদী বইছে। যে মাটির ওপর দিয়ে এই খরস্নেতা নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে হঠাতে করেই এক বিশাল ফাটল। একটা নদী যতখানি চওড়া হতে পারে ততখানি ফাঁক। নায়াগ্রাম জল ঐ ফাঁকের ভিতরে চলে যাচ্ছে। এটাও তো প্রপাত, কারণ পানি পড়ছে। তবে, সাধারণ জলপ্রপাতের মতো পাহাড় থেকে নিচে পড়ছে না। পড়ছে, সমতল থেকে বিশাল ফাটলের গহ্বরে। নায়াগ্রা তাই একেবারে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত।

ক. পৃথিবীর বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় কোনটিকে?

খ. নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য কী?

গ. নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথা থেকে প্রবাহিত হয়?

ঘ. নায়াগ্রামকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে কেন?



ରୌଦ୍ର ଲେଖେ ଜୟ

ଶାମସୁର ରାହମାନ

ବର୍ଗି ଏଲୋ ଖାଜନା ନିତେ,
ମାରଳ ମାନୁଷ କତ ।
ପୁଡ଼ଳ ଶହର, ପୁଡ଼ଳ ଶ୍ୟାମଳ
ଗ୍ରାମ ଯେ ଶତ ଶତ ।

ହାନାଦାରେର ସଙ୍ଗେ ଜୋରେ
ଲଡ଼େ ମୁକ୍ତିସେନା,
ତାଦେର କଥା ଦେଶର ମାନୁଷ
କଥନୋ ଭୁଲବେ ନା ।

ଆବାର ଦେଖି ନୀଳ ଆକାଶେ
ପାଯରା ମେଲେ ପାଖା;
ମା ହେଁ ଯାଯ ଦେଶର ମାଟି,
ତାର ବୁକେତେଇ ଥାକା ।

କାଳ ଯେଖାନେ ଆଧାର ଛିଲ
ଆଜ ସେଖାନେ ଆଲୋ ।
କାଳ ଯେଖାନେ ମନ୍ଦ ଛିଲ,
ଆଜ ସେଖାନେ ଭାଲୋ ।

କାଳ ଯେଖାନେ ପରାଜ୍ୟେର
କାଳୋ ସମ୍ଭ୍ୟା ହୁଁ,
ଆଜ ସେଖାନେ ନତୁନ କରେ
ରୌଦ୍ର ଲେଖେ ଜୟ ।



অনুশীলনী

১. কবিতার মূলভাব জ্ঞেনে নিই।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি জয়লাভ করে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ’ নামে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আগে এ দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হয়েছিলেন। এই কবিতায় পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কেন এদেশের সন্তানেরা সংহাম করেছিল সে কথাও বলা হয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বর্গি হানাদার খাজনা

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

হানাদারদের বর্গি খাজনা

ক. সরকারকে দেওয়া সকল নাগরিকের কর্তব্য।

খ. বহু পূর্বে বাংলায় এসে হানা দিত, মানুষ মারত, ধনসম্পদ লুট করত।

গ. পরাজিত করেই মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশকে স্বাধীন করেছিলেন।

৪. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক. বর্গি এলো খাজনা নিতে,
মারল মানুষ কত।

‘খাজনা নিতে’ অর্থ লুটতরাজ করত। বর্গিরা বাংলাদেশে এসে মানুষ মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে বাঙালির ধনসম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেত।

খ. তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবে না।

মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না, কারণ তারাই হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের এদেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন।

গ. মা হয়ে যায় দেশের মাটি,
তার বুকেতেই থাকা।

মা ও মাতৃভূমি সমান গর্বের, সমান আনন্দের। জননীহীন সন্তান যেমন দুর্ভাগা, যার মাতৃভূমি নেই সেও তেমনি ভাগ্যহীন।

৫. প্রশ়ঙ্গলোর উভয় মুখে মুখে বলি ও লিখি।

ক. বর্ণি কারা? তারা কী করেছিল?

খ. হানাদারদের কথা মানুষ কেন ভুলবে না?

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না কেন?

ঘ. মুক্তিসেনারা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং কেন?

ঙ. ‘কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে আলো।’— কথাটি ব্যাখ্যা করি।



৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আঁধার	আলো	কালো	সাদা	ভালো	মন্দ	জয়	পরাজয়	সকাল	সন্ধিয়া
-------	-----	------	------	------	------	-----	--------	------	----------

ক. বিশ্বকাপ ফুটবলে নিজ দলের দেখে ছেলেটি আনন্দে নেচে উঠলো।

খ. একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা ব্যাজ পরে শহিদ মিনারে যাই।

গ. হওয়ার আগেই আমরা বাড়ি পৌছে যাব।

ঘ. নামলে ঘন জঙ্গালের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না।

ঙ. ছেলের সঙ্গ ত্যাগ করাই উত্তম।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা শ্রেণিতে আবৃত্তি করি।

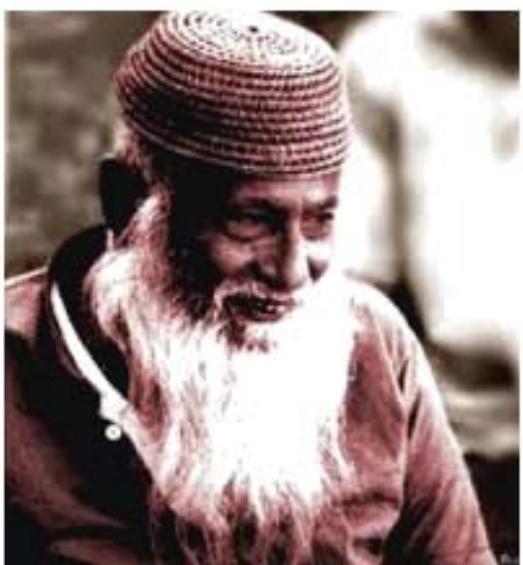


কবি-পরিচিতি

কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবরে পুরানো ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংহদী জেলার পাড়াতলী থামে। তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি। ছোটদের জন্য তিনি অনেক ছড়া, কবিতা ও মৃত্তিকথা লিখেছেন। ‘এলাটিৎ বেলাটিৎ’, ‘ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো’, ‘মৃত্তির শহর ঢাকা’ ইত্যাদি ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিখ্যাত বই। তিনি ২০০৬ সালের ১৭ই আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শামসুর রাহমান

মঙ্গলা আবদুল হামিদ খান ভাসানী



মঙ্গলা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

বালাই কৃষক মঙ্গল হামিদের অতি আপনজন, মঙ্গলা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। চিরকাল নির্বাচিত, নিশাপুরি মানুভের কাছাকাছি এসে দোড়িয়েছেন তিনি। মঙ্গলুম মানুভের সূর্য-দূর্ঘৰ্ষে কৌশল কাথ পিণিয়ে ভাসের কথা বলেছেন। সক্ষম করেছেন। এসব তিনি মঙ্গলুম অসমেতো।

সিরাজগঞ্জের খাসগঢ়া প্রাদের এক পরিষ্ঠ কৃষক পরিবার। এ পরিবারে আবদুল হামিদ খানের জন্ম হয় ১৮৮০ সালে। তাঁর বাবার নাম হাজী শরফুক আলী খান। মাঝের নাম মোসাফিদ মজিজুল খিবি। জন বয়সেই তিনি পিতৃযাতৃহীন হন। তাঁর এক চাচা ইন্দ্রাধীম খান তাঁকে পৈশবদ্বে আশের দেন। এই

চাচার কাছ থেকেই তিনি মাদরাসার পড়ালোনা করেন। এ সময় তিনি ইংরাজ থেকে আগত এক শীর সাহেবের স্নেহসূচি লাভ করেন। তিনি তাঁকে তারজের দেশবন্দ মাদরাসার পাঠিয়ে দেন। এ সময় তিনি দেশাভ্যোগে উত্তুল্প হন।

মাদরাসার পড়া শেষ করে তিনি টাঙাইলের কালমাড়ির এক প্রাইমারি ক্লে শিক্ষকতা প্রাপ্ত করেন। এখানে শিক্ষকতার সময় তিনি অমিদাঙ্গের অভ্যাচার, নির্বাচন মেধাতে পান। এর বিপুলে প্রতিবাদ ও সক্ষম শুন্মু করেন। কলে অমিদাঙ্গের বিষ-সজ্ঞের পত্তে তাঁকে কালমাড়ি ছাড়তে হয়।

বাইশ বছর বয়সে কল্পনা নেতা দেশবন্দু চিকিৎসন দাশের আদর্শে তিনি অনুপ্রাপ্তি হন। প্রেত তিনি গ্রাজনীতিতে সূজা হন। ধরণের অসহযোগ আলোচনে ঘোষ দেন। তাঁকে কালাধূম করা হয়। সজেজো যাস পর তিনি মৃত্যি পান। এরপর ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে তিনি এক সতীর ভাবণ দেন। এই ভাবণে তিনি কৃষক সাধারণের উপর অধিদারিদের শোষণ, নিপীড়ন ও অভ্যাচাঙ্গের কাহিনি ক্লে ধরেন। এই সতীর ভাবণের অস্য তাঁকে নিজের অন্তর্দৃষ্টি ছাড়তে হয়। তিনি ধরান চলে বাস আসামের অসমেরে। এ কজাই আসামের দুর্বাতি জেলার ভাসানচুরে তিনি এক বিশাল প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করেন। এ সতীর তিনি বাঢ়ানি কৃষকদের উপর অভ্যাচাঙ্গের ক্ষেত্রে অতিবাদ জানান। এই সমাবেশেই সাধারণ কৃষকরা তাঁকে ভাসানচুরের ঘঙ্গামা নাম

দেয়। পরে তাঁকে ভাসানী নাম দেয়। তখন থেকেই তাঁর পরিচয় হয় মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানী এদেশে একটি প্রিয় নাম।

মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, ‘আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি। এই মানুষেরা কাজ করে খেতে-খামারে, কাজ করে কলে-কারখানায়। এরা কৃষক, এরা শ্রমিক। আর এরাই জমিদার, মহাজন, মালিকের জুলুমের শিকার হয়।’

মূলত সারা জীবন তিনি এই নিপীড়িত মানুষের জন্তুই সংগ্রাম করেছেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি আসাম থেকে পূর্ববাংলায় চলে আসেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সংগঠনের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। তিনি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে বাস করতে শুরু করেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তিনি আবার গ্রেফতার হন।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়।

১৯৫৭ সালে ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারিতে এক বিশাল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলন ‘কাগমারি সম্মেলন’ নামে খ্যাত। সম্মেলনে যোগ দেন দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ। এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন।

মওলানা ভাসানী বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ করছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে তিনি পল্টন ময়দানে ভাষণ দেন। এই ভাষণে শোষণের এই কথাটিই বারবার উচ্চারণ

করে জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন— পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছে, এরূপ চলতে থাকলে পূর্ব পাকিস্তান একদিন স্বাধীন দেশ হয়ে যাবে।



মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পল্টন ময়দানে ভাষণ দেন



মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৭১ সালের ২৫ এ মার্চ মধ্যরাত থেকে দেশব্যাপী পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যায়জ্ঞ শুরু হয়। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি ভারতে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টাপরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। স্বাধীনতার পরও কোনো পদমর্যাদা ও মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তিনি সবসময় জনগণের পাশে থেকে বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি পালন করেন।

মওলানা ভাসানী নিজে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া করতে পারেননি। কিন্তু এ দেশের মানুষের শিক্ষা প্রসারে তাঁর অনেক অবদান ছিল। তিনি সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মহীপুরে হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, ঢাকায় আবুজর গিফারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন নিরহংকার আদর্শবান মানুষ। তাঁর জীবনচরণ ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ-সরল। তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে একটা সাধারণ বাড়িতে বাস করতেন। খেতেন সাধারণ মানুষের খাবার। এরকম অনাড়িস্বর জীবনযাপন খুব কম দেখা যায়।

১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৯৬ বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের দেশের রাজনীতিতে একটি যুগের অবসান ঘটে। তাঁকে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে আমরা প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম, প্রগতিশীল আদর্শ ও প্রতিবাদী চেতনার শিক্ষা পাই। তিনি চিরকাল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বেঁচে থাকবেন এ দেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নির্যাতিত নিপীড়িত মজলুম বিষ-নজর কারাবুদ্ধ প্রতিবাদী সমাবেশ^১
কাগমারি সম্মেলন প্রবাসী আআসমর্পণ মোহ অনাড়ম্বর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রবাসী | আআসমর্পণ | মোহ | সরকার | প্রতিবাদী

ক. যুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ হয়ে উঠেছিল।

খ. আজ প্রায় বিশ বছর ধরে আনিস সাহেব

গ. ছাড়া দেশ চালানো মুশকিল।

ঘ. সৎলোকের ধনসম্পত্তির উপরে থাকে না।

ঙ. পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর করে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. মজলুম জননেতা কে ছিলেন? কেন তাকে মজলুম জননেতা বলা হয়?

খ. মওলানা ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেন?

গ. কেন তাকে কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল?

ঘ. কীভাবে তার নাম মওলানা ভাসানী হলো?

ঙ. পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু কী?

চ. শিক্ষার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী কী অবদান রেখেছেন?

ছ. মওলানা ভাসানীর জীবন থেকে তুমি কী শিখতে পেরেছ?

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

মজলুম কারাবুদ্ধ প্রতিবাদ অনাড়ম্বর মোহ আআসমর্পণ নিপীড়িত

৫. জেনে নেই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ- ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের একজন মহান নেতা। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১৮৭০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের মুস্তাগঞ্জ জেলার তেলিরবাগ গ্রামে। তিনি যেমন ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, তেমনি ছিলেন একজন কবি ও সম্পাদক। এ দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সম্মতি প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলার সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় নেতা। ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা লিখে শ্রদ্ধা জানান।

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) টিক দিই।

ক. মওলানা ভাসানী চিরকাল কেমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন?

- | | |
|--------------|------------|
| ১. নির্যাতিত | ২. অবহেলিত |
| ৩. সুখী | ৪. বড়লোক |

খ. মওলানা ভাসানী কোন দেশের পীর সাহেবের স্নেহসূচিটি লাভ করেন?

- | | |
|-----------|----------------|
| ১. ইরাকের | ২. বাংলাদেশের |
| ৩. ভারতের | ৪. পাকিস্তানের |

গ. তাঁকে কাগমারি কেন ছাড়তে হয়?

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ১. গ্রামের মানুষের কারণে | ২. জমিদারদের কারণে |
| ৩. ব্যবসায়ীদের কারণে | ৪. রাজনৈতিক কারণে |

ঘ. মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে কী বলেছেন –

- | |
|------------------------------------|
| ১. আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি |
| ২. আমি আরামপ্রিয় মানুষের কথা বলি |
| ৩. আমি সুখী মানুষের কথা বলি |
| ৪. আমি ভালো মানুষের কথা বলি |

ঙ. মওলানা ভাসানী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর
সঙ্গে গঠন করেন-

- | | |
|--------------|---------------|
| ১. যুক্তফল্ট | ২. যুবকংগ্রেস |
| ৩. যুবলীগ | ৪. যুবফল্ট |

চ. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টাপরিষদের কী ছিলেন ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ১. সদস্য | ২. প্রেসিডেন্ট |
| ৩. সহকারী | ৪. কেউ নন |

ছ. তিনি কোন নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন ?

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ১. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী | ২. দেশবন্ধু চিন্তারঞ্জন দাশ |
| ৩. শেরে বাংলা ফজলুল হক | ৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান |

৫. বাক্যের সাথে মিল করে ঠিক শব্দের উপর টিক (✓) টিক দিই।

ক. মজলুম মানুষের সুখে দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের কথা বলেছেন—মওলানা
ভাসানী/শেরে বাংলা/ শহীদ সোহরাওয়ার্দী

খ. মওলানা ভাসানী কারাবুন্দি হওয়ার পর মুক্তি পান—তেরো/ পনেরো/ সতেরো মাস পরে

গ. তাঁকে ভাসানী নাম দেয়—ভাসানচরের/ কাগমারীর/ ঢাকার সমাবেশের পর

ঘ. মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা—পুড়িয়ে দেয়/ পাহারা দেয়/
তাদের দখলে নিয়ে নেয়



শহিদ তিতুমীর

তেতো, তিতু, তিতুমীর। শুনতে বেশ অবাক লাগছে, তাই না? তা হলে খুশেই বলি।

১৭৮২ সাল। পাটিমবজ্জোর চকরিশ পরগনা জেলা। সে জেলার বশিরহাট মহকুমার একটি গ্রাম চাঁদপুর (মতভাবে হায়দারপুর)। এ গ্রামে বাস করত এক বনিয়াদি মুসলিম পরিবার। সৈয়দ বংশ। এই বংশে জন্ম নেয় এক শিশু। ছেষ শিশুটি ছিল যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি বলিষ্ঠ তার গড়ন। শিশুটি ছিল খুব জেদি। শিশুকালে তার একবার কঠিন অসুব হলো। ঝোগ সারানোর জন্য তাকে দেওয়া হলো ভীষণ তেতো শুধু। এমন তেতো শুধু শিশু তো দূরের কথা বুঢ়োঠাও ঘুর্খে নেবে না। অথচ এই ছেষ শিশু বেশ খুশিতেই খেল সে শুধু। প্রায় দশ-বারোদিন এই তেতো শুধু খেল সে। বাড়ির গোকজন সবাই অবাক। এ কেমন শিশু, তেতো খেতে তার আনন্দ! এ জন্যে শুর ভাক নাম রাখা হলো তেতো। তেতো থেকে তিতু। তার সাথে মীর লাগিয়ে হলো তিতুমীর। তার প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী।

তিতুমীরের যখন জন্ম, যখন আমাদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন। তখনে ব্রিটিশ রাজত্ব। ইংরেজরা চালাত অভ্যাচার। অন্যদিকে ছিল দেশি জমিদারদের জুলুম। ইংরেজ কর্মচারীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলত দারুণ দাপটে। তিতুমীর এসব দেখতেন আর ভাবতেন, এদের হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাবে দেশের মানুষ।

তিতুমীরের গ্রামে ছিল একটি মাদরাসা। সেখানে শিক্ষক হিসেবে এলেন ধর্মপ্রাণ এক হাফেজ। নাম হাফেজ নেয়ামত উল্লাহ। তিতুমীর এ মাদরাসায় পড়তেন। তিনি অল্প সময়েই হাফেজ নেয়ামত উল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

সেকালে গ্রামে গ্রামে ডনকুষ্টি আর শরীরচর্চার ব্যায়াম হতো। শেখানো হতো মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া আর অসিচালনা। উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ তাড়ানোর জন্য গায়ে শক্তি সঞ্চয় করা। তিনি ডনকুষ্টি শিখে কুস্তিগির ও পালোয়ান হিসেবে নাম করলেন। লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া আর অসি পরিচালনাও শিখলেন। তাঁর অনেক ভক্তও জুটে গেল। তিতুমীরের গায়ে শক্তি ছিল প্রচুর। কিন্তু তিনি ছিলেন শাস্ত ও ধীর স্বভাবের।

একবার ওস্তাদের সঙ্গে তিনি বিহার সফরে বেরোলেন। মানুষের দুরবস্থা দেখে তাঁর মনে দেশকে স্বাধীন করবার চিন্তা এলো। তিনি মুসলমানদের সত্যিকার মুসলমান হতে আহ্বান জানালেন। আর হিন্দুদের বললেন অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াতে। হিন্দু-মুসলমান সকলে তাঁর কথায় সাড়া দিলেন।

১৮২২ সাল। তিতুমীরের বয়স তখন চাল্লিশ। তিনি হজ পালন করতে গেলেন মকায়। সেখানে পরিচয় হলো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হ্যরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভাইর সঙ্গে। তিনি ছিলেন সংগ্রামী পুরুষ এবং ধর্মপ্রাণ। তিতুমীর তাঁর শিষ্য হলেন। দেশে ফিরে তিনি স্বাধীনতার ডাক দিলেন। ডাক দিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে, নীলকরদের বুখতে আর নিজেদের সংগঠিত হতে। কিন্তু প্রথম বাধা পেলেন জমিদারদের কাছ থেকে। তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু হলো। নিজ গ্রাম ছেড়ে তিনি গেলেন বারাসাতের নারকেলবাড়িয়ায়। নারকেলবাড়িয়ার লোকজন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলো। হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তৈরি করলেন এক দুর্ভেদ্য বাঁশের দুর্গ। এটাই নারকেলবাড়িয়ার ‘বাঁশের কেল্লা’। তাঁর এ কেল্লায় সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল চার-পাঁচ হাজার। চবিশ পরগনা, নদীয়া আর ফরিদপুর জেলা তখন তাঁর দখলে। ইংরেজদের কোনো কর্তৃত্ব রইল না এসব অঞ্চলে। এ দুর্গে তিনি তাঁর শিষ্যদের লড়াইয়ের শিক্ষা দিতে লাগলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার কৌশল ও প্রস্তুতি শেখাতে লাগলেন। এ খবর চলে গেল ইংরেজ শাসকদের কাছে। ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলাল দেশি জমিদাররা। ১৮৩০ সালে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পাঠানো হয় তিতুমীরকে দমন করবার জন্য। কিন্তু আলেকজান্ডার তাঁর সিপাহি বাহিনী নিয়ে পরাস্ত হন তিতুমীরের হাতে। তারপর তিতুমীর কয়েকটি নীলকুঠি দখল করে নেন।

১৮৩১ সালের ১৯এ নভেম্বর। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তখন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল। তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি পাঠালেন বিরাট সেনাবহর আর গোলন্দাজ বাহিনী। এর নেতৃত্বে দেওয়া হলো সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্টকে। স্টুয়ার্ট আক্রমণ করলেন তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। তখন ভালো করে ভোর হয়নি। আবছা আলো। স্টুয়ার্টের ছিল হাজার হাজার প্রশিক্ষিত সৈন্য আর অজস্র গোলাবাবুদ। তিতুমীরের ছিল মাত্র চার-পাঁচ হাজার স্বাধীনতাপ্রিয় সৈনিক। তাঁর না ছিল কামান, না ছিল গোলাবাবুদ, বন্দুক। তবে তাঁদের মনে ছিল পরাধীন দেশকে স্বাধীন করবার অমিত তেজ।

প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। তিতুমীর আর তাঁর বীর সৈনিকরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজ সৈনিকদের গোলার আঘাতে ছারখার হয়ে গেল নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহিদ হলেন বীর তিতুমীর। শহিদ হলেন অসংখ্য মুক্তিকামী বীর সৈনিক। তিতুমীরের ২৫০ জন সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দি করল। কারো হলো কারাদণ্ড, কারো হলো ফাঁসি। এভাবেই শেষ হলো যুদ্ধ। কিন্তু এ যুদ্ধের বীর নায়ক তিতুমীর অমর হয়ে রইলেন এ দেশের মানুষের মনে। আজ থেকে প্রায় পৌনে দু শ বছর আগে তিনি পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে বীর তিতুমীরই হলেন বাংলার প্রথম শহিদ।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

জেদি পরাধীন দাপটে ডনকুষ্টি অসিচালনা দুর্ভেদ্য দুর্গ বাঁশের কেল্লা
শায়েস্তা অমিত তেজ মুক্তিকামী

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরাধীন	ডনকুষ্টি	অসিচালনা	দুর্গ	দাপটে	মুক্তিকামী
--------	----------	----------	-------	-------	------------

- ক. তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন আমাদের বাংলাদেশসহ পুরো ভারতবর্ষ ছিল।
- খ. ইংরেজ কর্মচারীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলত দারূণ।
- গ. তিনি লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া আর শিখলেন।
- ঘ. সেকালে গ্রামে গ্রামে আর শরীরচর্চার ব্যায়াম হতো।
- ঙ. শহিদ হলেন অসংখ্য বীর সৈনিক।
- চ. হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তৈরি করলেন বাঁশের।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

- ক. ‘তিতুমীর’ নামটি কেমন করে হলো? তাঁর প্রকৃত নাম কী?
- খ. এ দেশকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করার চিন্তা কেন তাঁর মনে এলো?
- গ. তিন্দু-মুসলমান সবাইকে তিনি কী বলে একতাবন্ধ করতে চাইলেন?
- ঘ. ইংরেজদের পাশাপাশি কারা এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত?
- ঙ. নারকেলবাড়িয়া কোথায়? এখানে তিতুমীর কী তৈরি করলেন?
- চ. কত খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের কাছে ব্রিটিশ শক্তি পরাজিত হয়?
- ছ. কখন কোন ইংরেজ সেনাপতির নেতৃত্বে তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হয়?
- জ. তিতুমীর কীভাবে শহিদ হলেন?
- ঝ. পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম শহিদ কে?
- ঞ. শহিদ তিতুমীর কেন অমর হয়ে আছেন?

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

বাঁশের কেল্লা জেদি সশন্ত শায়েস্তা প্রিয়পাত্র দুর্ভেদ্য

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) টিক দিই।

- ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী?

১. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
২. সৈয়দ মীর নিসার আলী
৩. মোঃ শামসুল হক
৪. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

- খ. তিতুমীরের যখন জন্ম, তখন এদেশ কাদের অধীন ছিল?

- | | |
|---------------|----------------|
| ১. ফরাসিদের | ২. ডাচদের |
| ৩. ব্রিটিশদের | ৪. পর্তুগিজদের |

- গ. মকায় কোন সংগ্রামী পুরুষ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সাথে তিতুমীরের পরিচয় হয়েছিল?

১. হ্যরত শাহ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সঙ্গে
২. হাফেজ নেয়ামত উল্লার সঙ্গে
৩. গোলাম মাসুদের সঙ্গে
৪. হ্যরত আলী (রা) এর সঙ্গে

- ঘ. তিতুমীরের দুর্গের নাম কী?
১. লাঠির কেল্লা
 ২. লোহার কেল্লা
 ৩. বেতের কেল্লা
 ৪. বাঁশের কেল্লা
- ঙ. তিতুমীর ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে কত সালে পরাজিত করেন?
১. ১৮২২
 ২. ১৮৩০
 ৩. ১৮৩১
 ৪. ১৮৩৪
- চ. তিতুমীর ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন কেন?
১. তাঁর সৈনিকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে
 ২. প্রশিক্ষিত সৈন্য ও উন্নত অস্ত্র-শস্ত্রের অভাবে
 ৩. সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে
 ৪. অদৃরদর্শিতার কারণে

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

পরাধীন	স্বাধীন	বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ।
তেতো	-----	-----
পরাস্ত	-----	-----
দুর্বল	-----	-----
আনন্দ	-----	-----
শান্ত	-----	-----

৭. কর্ম-অনুশীলন।

শহিদ তিতুমীরের ‘বাঁশের কেল্লা’ সম্পর্কে যা জান লেখ।

অপেক্ষা

সেলিনা হোসেন

রুমা আৰ রুবা দুই বোন। ওদেৱ খুব ভাব। একসঙ্গে ক্ষুলে যায়। একসঙ্গে খেলে। খুব কমই
ঝগড়া হয় ওদেৱ।

রুমাৰ বয়স বারো আৰ রুবাৰ দশ।

দুইজনেৰ জন্মদিন নিয়ে ওদেৱ মা-বাবাৰ এক একটি গল্প আছে। ওদেৱ মা রাহেলা বলে,
যেদিন রুমাৰ জন্ম হয় সেদিন বাড়িৰ উঠোনেৰ শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভৱে ছিল। এত ফুল
নাকি আৱ কখনো দেখেনি রাহেলা বানু। খুশবু ছড়িয়ে গিয়েছিল চারদিকে।

রুবা উদগ্ৰীব হয়ে বলে, মা আমাৰ গল্পটা বল।

তোৱ গল্পটা আমি বলব, মা। এ কথা বলে জসীম মিয়া মেয়েকে জড়িয়ে ধৰে। বলে, যেদিন তুই
হলি সেদিন বাড়িৰ বাইরেৰ আমগাছটার নিচে বসে আছি। হঠাত মাথাৰ ওপৱে তাকিয়ে দেখি
আমেৱ বোলে ভৱে আছে গাছটা। এত বোল আসতে দেখিনি আগে। বোলেৰ গন্ধে চারদিক ভৱে
গেছে।

দুই বোন মা-বাবাৰ আদৱেৰ ছায়ায় বড় হয়। ক্ষুলে যাওয়াৰ পথে বুনোফুল ছিঁড়ে বেণীৰ সঙ্গে
গৈথে রাখে। ফড়িৎ ধৰে। আবাৰ আকাশে উড়িয়ে দেয়। ফুলেৰ পাপড়ি ছিঁড়ে খাতার ভিতৱ চাপা
দিয়ে রাখে। শুকিয়ে গেলে বাবাৰ কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, বাবা তোমাৰ হাজাৰ বছৱ আয়ু
হোক। মায়েৰ কপালে লাগিয়ে দিয়ে বলে, মা তোমাৰ ভাতেৰ হাঁড়ি ভৱা থাকুক।

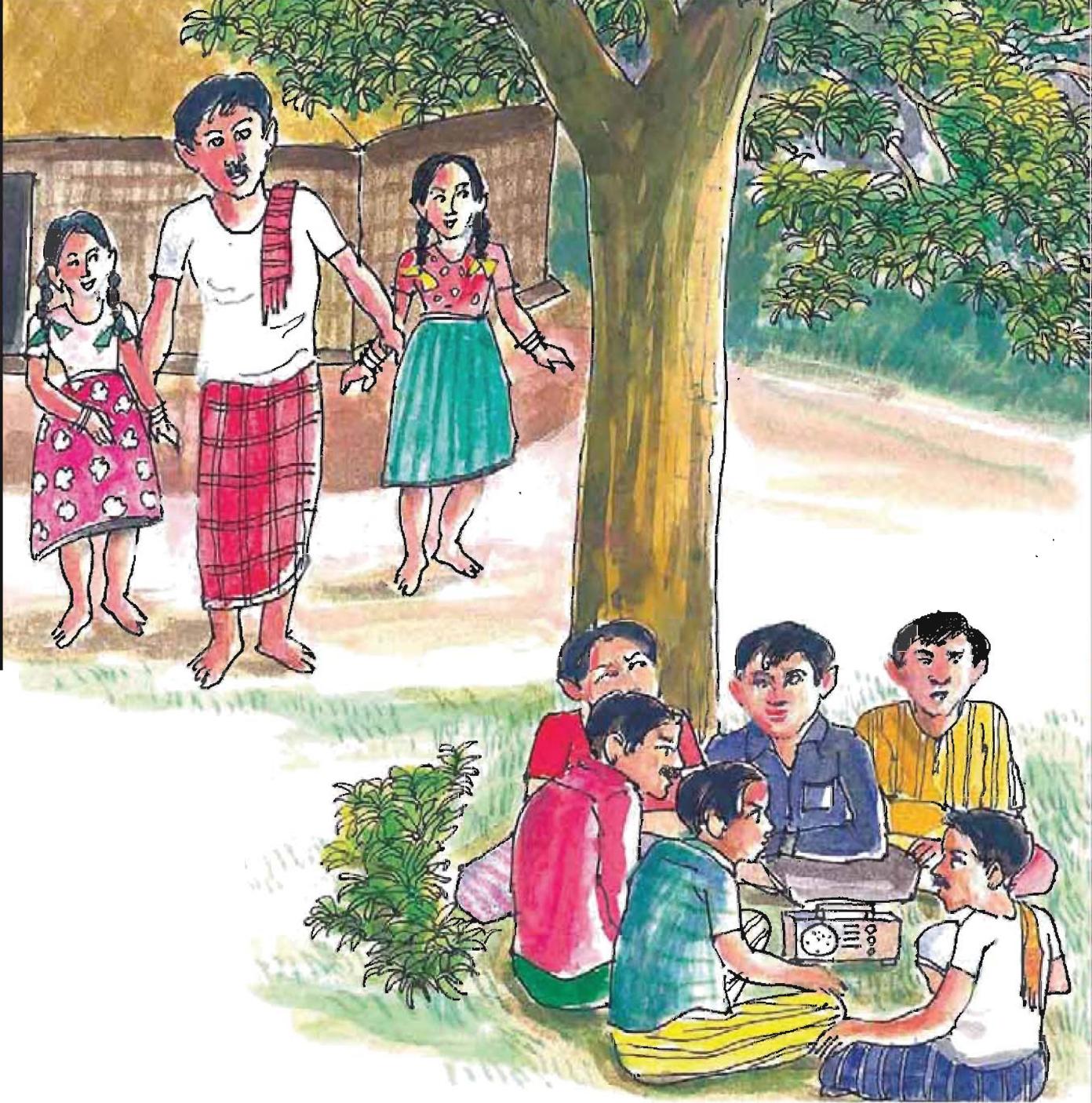
জসীম মিয়া ওদেৱ কপালে চুমু দিয়ে বলে, আমাৰ মেয়েগুলোৰ অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ, মা।
চাইলে লেখাপড়াৰ জন্য তোদেৱ আমি ঢাকা পাঠাব।

দুই বোন খুশিতে হাততালি দেয়। মা-বাবা ওদেৱ উৎফুল্ল মুখেৰ দিকে তাকিয়ে থাকে। একদিন
জসীম মিয়া বাজাৰে যায়। সেখান থেকে দুই সেৱ চাল-ডাল কিনে বাড়ি ফিরে বারান্দায় ধপাস
কৱে বসে পড়ে। ছুটে আসে রাহেলা বানু।

— কী হয়েছে?

— যুদ্ধ।

— যুদ্ধ? রাহেলা বানু অবাক হয়ে বলে।



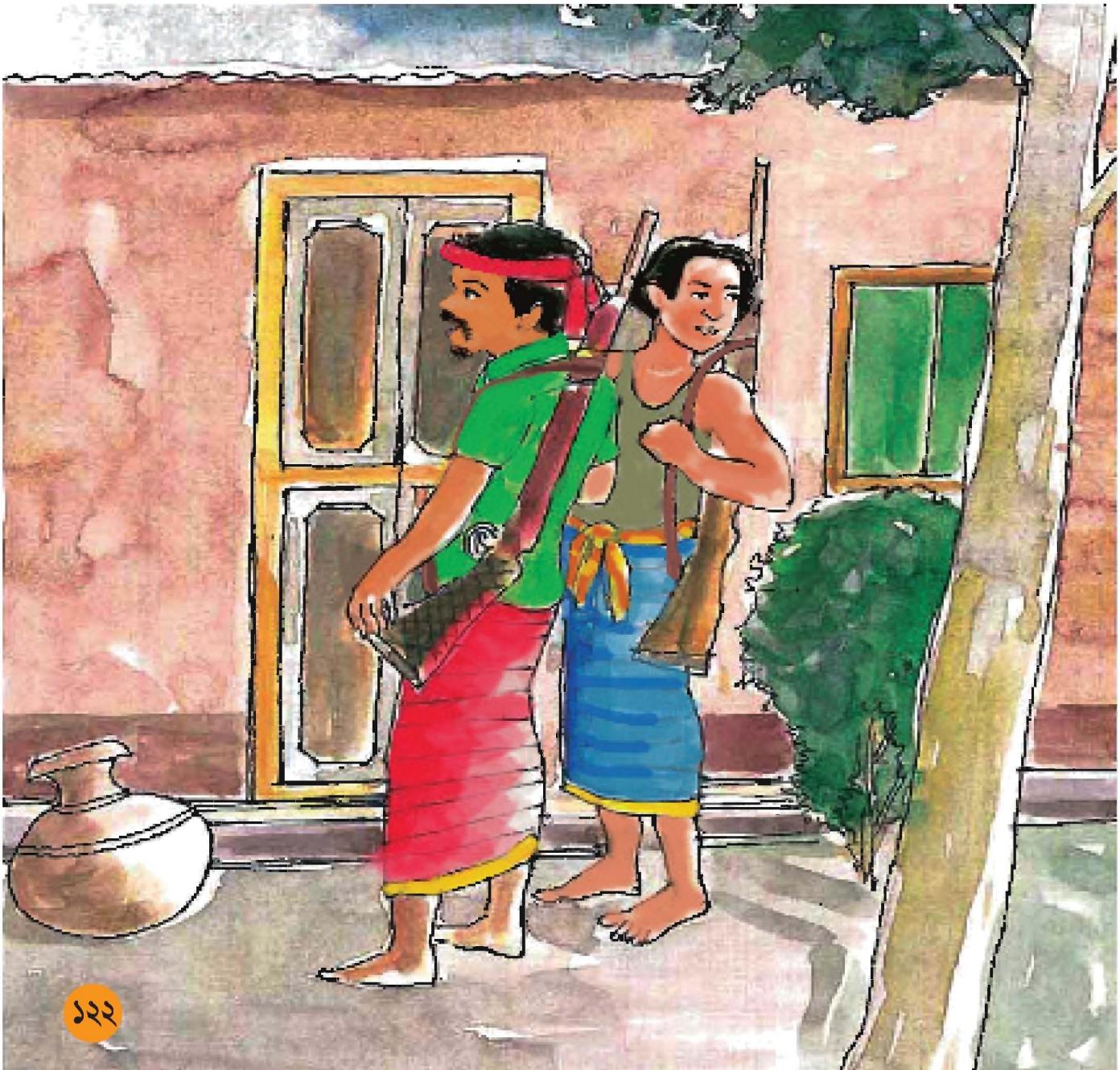
কিছু বলার আগেই জসীম শুনতে পায় বাইরে হইচই। ও দুই মেয়ের হাত ধরে বাইরে আসে। দেখে লোকজন আমগাছের নিচে গোল হয়ে বসে রেডিওতে খবর শুনছে। বিবিসির খবরে বলছে, ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে গণহত্যা শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

জসীমের মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনছিল—‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

ଲୋକଜନ ଖବର ଶୁଣେ ଉଡ଼େଜିତ ହୟେ ବଲେ, ଆମାଦେର ସବାଇକେ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ହବେ ।

ବୁମା-ବୁବା ବାବାର ହାତ ଛାଡ଼ିଯେ ଅନ୍ୟ ଛେଳେମେଯେଦେର କାହେ ଯୁଦ୍ଧେର କଥା ବଲାର ଜନ୍ୟ ଛୁଟ ଦେୟ ।
ଚିତ୍କାର କରେ ବଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ହବେ ରେ । ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ।

କରେକମାସ ପରେ ଗୌୟେ ମିଲିଟାରି ଆସେ । ଜୁମାମାର ଶହର ଥିଲେ ଆସା ଛେଳେଦେର କାହୁ ଥିଲେ ରାଇଫେଲ
ଚାଲାନୋ ଶିଖେ ନେଯ । ତାରପର ଗଡ଼େ ତୋଳେ ମୁକ୍ତିବାହିନୀ । ରାହେଲା ମେଯେଦେର ନିଯେ ବାଡ଼ିତେ ଥାକବେ ।
ଜୁମାମାର ଚେଯେଛିଲ ରାହେଲା ଓର ବାବାର ବାଡ଼ି ଚଲେ ଯାକ, କିନ୍ତୁ ରାହେଲା ଯେତେ ରାଜି ହୟନି ।



নদীর ধারেই বাজার। সেদিন বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি মিলিটারির সামনে পড়ে যায় জসীম। ওরা বাজারের দোকান ও ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসে। একটি বুলেট এসে লাগে জসীমের বুকে। নদীর ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ও। রক্তে ভেসে যায় মাটি। নিজেরই রক্তে মাখামাখি হয়ে যায় ওর শরীর।

মিলিটারিকাং চলে গেলে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা ঘরে ফিরে আসে। রাহেলাও মেয়েদের নিয়ে আসে বাড়িতে। অনেক বাড়ি পুড়ে গেলেও ওদের বাড়িতে আগুন লাগেনি। বড় আমগাছটা ঘরের চাল আড়াল করে রেখেছে বলে আগুন এখানে আসতে পারেনি।

রাহেলা সারা রাত জসীমের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু জসীম বাড়ি ফেরে না। রুমা-রুবা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যায়।

পরদিন গাঁয়ের লোকেরা জসীমের লাশ নিয়ে আসে বাড়িতে। রুমা-রুবা কিছুক্ষণ বাবাকে দেখে নিশ্চুপ হয়ে যায়। যেন ওরা কথা বলা ভুলে গেছে। রাহেলা তো বারবার জ্ঞান হারাচ্ছে। গাঁয়ের মেয়েরা ওদের মাকে দেখাশোনা করছে। দুই বোন রান্নাঘরের দরজায় চুপ করে বসে থাকে।

রুবা রুমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু?

রুমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে, বাবার মরে যাওয়া।

দুইজন আকাশের দিকে তাকায়। অনেক দূরে কালো ধোঁয়ার মতো কিছু একটা আকাশের দিকে উঠছে। উঠছে তো উঠছেই।

ওরা বুবাতে পারে পাশের গ্রামে আগুন দিয়েছে পাকিস্তানি মিলিটারি।

দুই বোন আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দুইজনেই বুবাতে পারে যুদ্ধ মানে কী!

ঘোর বর্ষা। বৃষ্টির তোড়ে ঢুবে যায় মাঠঘাট। রাহেলা বানু শুকনো মুখে বারান্দায় বসে থাকে। দুই বোন ধানখেতের আলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পানি থেকে কুঁচো চিংড়ি ধরে আনে। ওদের মা অন্যের বাড়ি থেকে আনা চালে ভাত রান্না করে।

দু-মুঠো চাল মাটির কলসিতে জমিয়ে রাখে রাহেলা বানু। রাতে কোনো মুক্তিযোদ্ধা এলে তাঁর জন্য ভাত রান্না করবে। দুই বোন শুকনো লাকড়ি কুড়িয়ে এনে রান্নাঘরে জমিয়ে রাখে। যদি লাকড়ির দরকার হয় তখন কী দিয়ে ভাত রান্না করবে মা? দুই বোন অধীর অপেক্ষায় থাকে।

ঝুঁসে রাতে বৃষ্টি ছিল না। জ্যোৎস্নায় ভরা ছিল উঠোন।

গভীর রাতে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা আসে ওদের বাড়িতে।

চুপিচুপি ডাকে, মা দরজা খোল মাগো—

রুবা ধড়মড়িয়ে উঠে রুমাকে ডাকে। ও ঠেলে মাকে জাগায়।

— মা ওঠো। শোন, কেউ এসেছে। রাহেলা বানু দরজায় টুকটুক শব্দ শোনে। দরজার কাছে গেলে আবার শুনতে পায় সে ডাক, মা দরজা খোল।

রাহেলা কাঁপা হাতে দরজা খুললে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ওদের একজন বলে, ট্রেনিংয়ের সময় জসীম কাকু আমাদের বলেছিলেন দরকার হলে যেন আপনার কাছে আসি।

— মা, আপনি আমাদের চিনবেন না। আমাদের খিদে পেয়েছে। ভাত খেয়েই চলে যাব।

— কোথায় যাবে? রুমা জিজ্ঞেস করে।

— নদীর ওপারে। ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প আছে।

— তোমরা যুদ্ধ করবে? রুবা জানতে চায়।

— হ্যাঁ, আমরা পাকিস্তানি মিলিটারির ক্যাম্প আক্রমণ করব।

— তোমাদের রাইফেলগুলো ছুঁয়ে দেখি? রুমা গভীর আবেগে বলে।

— হ্যাঁ, দেখ।

দুজনে দুবোনের কোলে রাইফেল দুটো দিয়ে দেয়। রাইফেল দুটো ওরা কোলে নিয়ে বসে থাকে। মা রান্না চড়ায়। কিছুক্ষণ পর রাহেলা গরম ভাত নিয়ে আসে গামলা ভরে। সঙ্গে ডিম-আলুর তরকারি। যোদ্ধা দুইজন গপগপিয়ে খায়। দেরি করার সময় নেই। নদীর ঘাটে ওদের জন্য নৌকা নিয়ে বসে আছে অন্যরা। দেরি করা চলবে না। খাওয়া শেষ হলে রাহেলা বলে, তোমরা আবার আসবে তো?

দরকার হলে আসতে পারি। নইলে অন্যেরা আসবে। কেউ না কেউ আসবে।

রাহেলা বানুকে সালাম করে দুই বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে চলে যায় মুক্তিযোদ্ধারা।

বর্ষা শেষ।

আশ্বিনের শিউলি ফোটার দিন শুরু হয়েছে। একদিন দরজায় টুকটুক শব্দ হয়।

— খুকুমণিরা দরজা খোল।



দুই বোন লাফ দিয়ে উঠে দরজা খোলে। মুক্তিযোদ্ধারা আসে। ভাত খায়। নয়তো একটু ঘুমিয়ে
নেয়। রাতের অন্ধকারে আবার চলে যায়।

ঘোরতর যুদ্ধ চলছে চারদিকে।

রুমা আর রুবা রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না।

ওরা আবার অপেক্ষা করে একটি ডাক শোনার জন্য,

— খুকুমণিরা দরজা খোল, আমরা মুক্তিযোদ্ধা।

অনূশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

খুশবু উদগ্রীব বিবিসি গণহত্যা বঙ্গবন্ধু ট্রেনিং গপগপিয়ে মুক্তিবাহিনী
মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প মিলিটারি

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বঙ্গবন্ধুর মিলিটারির গণহত্যা উদগ্রীব বিবিসির মুক্তিযোদ্ধারা

ক. রুবা হয়ে বলে, মা আমার গল্পটা বল।

খ. সবাই আমগাছের নিচে বসে রেডিওতে খবর শুনছে।

গ. ঢাকা শহরে গত মধ্যরাতে শুরু করেছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী।

ঘ. জসীমের মনে পড়ে কিছুদিন আগে ওরা ৭ই মার্চের ভাষণ শুনছিল।

ঙ. বিকেলে বাজারে গেলে পাকিস্তানি সামনে পড়ে যায় জসীম।

চ. রাতে এলে তার জন্য ভাত রান্না করবে।

৩. প্রশ়ঙ্গুলোর উভয় মুখে বলি ও শিথি।

ক. বুমার জন্মদিনের গল্পটি কী?

খ. রুবার জন্মদিনের গল্পটি কী?

গ. রাহেলাবানু প্রতিদিন দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রেখে দিত কেন?

ঘ. গভীর রাত পর্যন্ত দুই বোন কেন জেগে থাকত?

ঙ. মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জসীম মিয়ার পরিবারের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।

চ. “আমাৰ মেয়েগুলোৱ অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ মা।” – “অনেক বুদ্ধি” এবং “বড় হ”

বলতে তুমি কী বোঝ?

ছ. একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য কী কী যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা দরকার ?

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে দুই বোন কোথায় রাখতো?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ১. বইয়ের ভিতর | ২. বালিশের নিচে |
| ৩. কোটার ভিতর | ৪. খাতার ভিতর |

খ. আমগাছের নিচে বসে জসীম কিসের খবর শুনছিল?

- | | |
|-----------------|----------------|
| ১. বাজারের খবর | ২. যুদ্ধের খবর |
| ৩. গণহত্যার খবর | ৪. বাড়ির খবর |

গ. বুবা রূমার হাত ধরে বাঁকিয়ে বলে, যদি মানে কী বুবু? রূমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে-

১. বাবার মরে যাওয়া ২. মায়ের মরে যাওয়া
৩. ভাই বোনের মরে যাওয়া ৪. স্বামী মরে যাওয়া

ସ. କଥନ ଶିଉଲି ଫୁଲ ଫୋଟେ?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ১. আশ্বিন মাসে | ২. কার্তিক মাসে |
| ৩. দিনের বেলা | ৪. মাঘ মাসে |

৫. শব্দগুলোকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ অনুযায়ী সার্জাই

এমন কিছু শব্দ আছে যা দিয়ে কারোর নাম, জায়গার নাম বোঝায় সেগুলো বিশেষ। যেমন—
নদী শুকিয়ে গেছে। এখানে ‘নদী’ বিশেষ পদ। আবার এমন শব্দ আছে যা দিয়ে বিশেষ
শব্দের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা বোঝায় সেগুলো বিশেষণ পদ। যেমন— মুনা
দৌড়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। এখানে ‘দ্রুত’ বিশেষণ পদ। এবার নিচের শব্দগুলো থেকে বিশেষ
ও বিশেষণ পদ আলাদা করি।

গাছ, ভাত, শুকনো, ভীষণ, নদী, কাঁপা, দরজা, রাইফেল, গরম, গভীর, হাঁড়ি, দ্রুত।

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

জন্ম	মৃত্যু	যুদ্ধের সময় দেশের অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছিল।
কানা
ভরা
যুদ্ধ
দূর
শুকনো

৭. বাক্য রচনা করি।

জন্মদিন আয় অপেক্ষা মুক্তিঘোষণা রেডিও

৮. কথাগুলো বুঝে নিই।

ধপাস করে পড়া – হঠাতে ধপ করে পড়া। ট্রাক থেকে চালের বস্তাটি ধপাস করে পড়ে গেল।

মুখ খুবড়ে পড়া – উপুড় হয়ে বা হুমড়ি খেয়ে পড়া। ছেলেটা হোঁচট খেয়ে মুখ খুবড়ে পড়ে গেল।

গপগপিয়ে খাওয়া – একসঙ্গে বেশি খাবার মুখে পুরে দ্রুত খাওয়া। সে গপগপিয়ে সব ভাত খেয়ে ফেলল।

দুই সের – আমাদের দেশে আগে ওজন মাপের জন্য ‘সের’ ব্যবহার করা হতো।

১ সের পরিমাণ বর্তমান মাপে ১ কেজির কিছু কম (প্রায় ০.৯৩৫ কেজি)।

১ কেজি = ১.০৭ সের (প্রায়)

৯. কর্ম-অনুশীলন।

আমার শ্রেণিশিক্ষক, মা-বাবা, দাদা-দাদি, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্প শুনে তা লিখি ও শ্রেণির সহপাঠীদের পড়ে শোনাই।



সেলিনা হোসেন

লেখক-পরিচিতি

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট উপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। তিনি ১৪ই জুন ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা একাডেমিতে পরিচালক পদে থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। ‘সাগর’, ‘গল্পে বর্ণমালা’, ‘কাকতাড়ুয়া’, ‘চাঁদের বুড়ির পাতা ইলিশ’ ইত্যাদি তাঁর লেখা শিশু-কিশোর উপযোগী বই। তিনি সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। ২০০৯ সালে ‘একুশে পদক’ লাভ করেন। ২০১০ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা থেকে তিনি ডিলিট উপাধি পান। ২০১১ সালে দিল্লির সাহিত্য একাডেমি থেকে প্রেমচান্দ ফেলোশিপ পান।

ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜେନେ ନିଇ

ଶବ୍ଦ

ଅର୍ଥ

ଆ

ଆଚିନ୍ପନ
ଅବଧାରିତ
ଆବରୁଦ୍ଧ
ଅହକାର
ଅପାର
ଅନାଡୁମ୍ବର
ଅମିତ ତେଜ
ଅଭିଭୂତ
ଆସିଲାନା

- ଅଚେନ୍ନା ସ୍ଥାନ ।
- ଅନିବାର୍ୟ, ଯା ହବେଇ, ନିର୍ଧାରିତ ।
- ଶତ୍ରୁ ଦିଯେ ବୈଟିତ, କଦମ୍ବ ।
- ନିଜେ ଅନେକ ବଡ଼ କେଟ୍ - ଏରକମ ମନେ କରା ।
- ଅଗଧି, ଅସୀମ ।
- ସାଦାସଥା ।
- ଅସୀମ ସାହସ ଆର ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ।
- ଭାବାବିଷ୍ଟ ବା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଁ ପଡ଼ା ।
- ତଳୋଯାର ନିଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରାର ବିଦ୍ୟା ।
- ଯାର ମୂଳ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ କରା ଯାଇ ନା ।

ଅମୂଳ୍ୟ

ଆ

ଆସନ୍ନ
ଆଚାଦନ
ଆତ୍ମାନକାରୀ
ଆଅସମର୍ପଣ
ଆନକୋରା
ଆସ୍ତାନା
ଆଟେପ୍ଟେପ୍ଟେ
ଆରାଫାତ
ଆମିର

- ନିକଟ ।
- ଢାକନି, ଛାଉନି ।
- ନିଜେର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେଛେନ ଯିନି ।
- ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅନ୍ୟେର ବଶ୍ୟତା ଦ୍ୱାରାକାର ।
- ନତୁନ ।
- ବସବାସେର ଜାଯଗା ।
- ସର୍ବାଙ୍ଗେ, ସାରା ଶରୀରେ ।
- ମଙ୍କା ଥେକେ ପ୍ରାୟ ବାରୋ ମାଇଲ ପୂର୍ବେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୟଦାନ ।
- ବଡ଼ଲୋକ; ଧନୀ; ସମ୍ପଦଶାଲୀ ସନ୍ତ୍ଵାନ୍ତ ମୁସଲମାନ; ମୁସଲମାନ ଶାସକେର ଉପାଧି

ଇ

ଇଞ୍ଜିତ

ଉ

ଉଦ୍‌ଦୀବ
ଉପତ୍ୟକା

ଟ

ଉର୍ମି
ଉର୍ମିମାଳା
ଉପାସନା

ଏ

ଏଫ୍‌ଏ
ଏକ୍‌ପେରିମେନ୍ଟ

ଏୟୁ

ଏତିହାସିକ

କ

କଲ୍ପକାହିନୀ

କାନାଡା
କାରାବୁଦ୍ଧ
କାବାଶରିଫ
କଢ଼ି
କିଚିର ମିଚିର
କିରଣ
କ୍ରୀତଦାସ
କୁମାର

- ଇଶାରା ।

- ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଗେକ୍ଷା କରା, ଖୁବ ଆଗ୍ରହୀ, ବସ୍ତ ।
- ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତେର ମାବାଖାନେର ସମତଳ ଭୂମି ବା ନିଚୁ ଭୂମି ଅଥବା ପାହାଡ଼-ପର୍ବତେର ପାଶେର ଭୂମି ।
- ନଦୀ ଓ ସାଗରେର ଢେଡ଼ ।
- ଢେଟ୍‌ସମ୍ଭ୍ର, ଢେଟ୍‌ଗୁଲୋ ।
- ଏବାଦତ; ଆରାଧନା; ଆଲ୍ଲାହର ଧ୍ୟାନ ।
- (Final Arts) ଆଜକେର ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷାର ସମତୁଳ୍ୟ ।
- ପରୀକ୍ଷା-ନିରୀକ୍ଷା ।
- ଯୀରା ଇତିହାସ ଲେଖେନ ବା ଭାଲୋ ଜାନେନ । ଇତିହାସେ ସ୍ଥାନ ଲାଭେର ଯୋଗ୍ୟ ବା ଇତିହାସ-ଭିତ୍ତିକ ହେଲେ ତାକେ ଏତିହାସିକ ବଳା ହୁଏ ।
- ଯେ କାହିନି କଲ୍ପନା କରେ ଲେଖା ହୁଏ । ଏକ ପ୍ରକାର କଲ୍ପକାହିନି ଆହେ ଯା ବିଜ୍ଞାନକେ ପ୍ରଧାନ କରେ ଲେଖା ହୁଏ, ତାକେ ବଳା ହୁଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଲ୍ପକାହିନି ।
- ଉତ୍ସର ଆମେରିକା ମହାଦେଶରେ ଏକଟି ଦେଶ ।
- ଜେଲଖାନା ବା କାରାଗାରେ ଆଟକ ରାଖା ।
- ମଙ୍କାଯ ଅବସ୍ଥିତ ବିଖ୍ୟାତ ଆଲ୍ଲାହର ସର ।
- ଏକ ଧରନେର ଛେଟ୍ ସାଦା ବିନୁକ ।
- ପାଖିର ଡାକାଡାକିର ଆଓୟାଜ ।
- ଆଲୋ ।
- କେଳା ଗୋଲାମ; ମୂଳ୍ୟ ଦିଯେ ଯେ ଭୃତ୍ୟକେ ଯାବଜ୍ଜୀବନେର ଜନ୍ୟ କେଳା ହେଁଥେଛେ ।
- ରାଜାର ଛେଲେ (ରାଜକୁମାର) ।

ক
কৰ্নিশ
কাঁকন
কোলাহলকল

- মাথা নত করে অভিবাদন করা।
- হাতে পরার গহনা।
- কোলাহল হলো অনেক মানুষের শোরগোল, গোলমাল। আর ‘কল’ বলতে বোবায় মানুষের গলার সুন্দর আওয়াজ। এখানে খেলায় সকলে এক সঙ্গে গোল-গোল টিকার করলে বেশ ভালো শোনায় বলে ‘কোলাহলকল’ বলা হয়েছে।
- সৈনিক বা যোদ্ধাদের অস্থায়ী ঘাঁটি। সেনাছাউনি।

ক্যাম্প

খ
খাজনা
খাটিয়া
খুশুৰ
খ্রিষ্টপূর্ব

- কর বা ট্যাঙ্ক।
- কাঠের তৈরি খাট।
- সুগন্ধি
- যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বের বৎসর বোবাতে বলা হয় খ্রিষ্টপূর্ব, আর তার জন্মের পরের বছরগুলোকে বলা হয় খ্রিষ্টাব্দ।

ক্ষ

ক্ষত

গ
গপগপিয়ে
গণহত্যা
গহৰ
গৰ্জে ওঠা
গৰ্দান
গিরিডি

- শৱীরের কাটা স্থান বা আঘাত পাওয়া স্থান।
- গপগপ করে।
- অনেক লোককে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা।
- গৰ্জ।
- ঝুঁকার দিয়ে ওঠা।
- ঘাড়, গলা।
- ভারতের ঝাড়খন রাজ্যে অবস্থিত। এটি গিরিডিঃ জেলার একটি প্রধান শহর। ১৮৭২ সালের আগে স্থানটি হাজারিবাগ জেলার মধ্যে ছিল।
- গৃহস্থ, সৎসারী লোক। গেরস্ত লোকের বহু কাজকর্ম থাকে।

গেরস্ত

ঘ
ঘোৱ

চ
চকাচকি
চম্পলোক
চৱণ
চিনচিন

- অত্যন্ত, অনেক বেশি, গভীর।
- হাঁসজাতীয় পাখি।
- চাঁদের দেশ।
- পা।
- অল্প অল্প ব্যথা বা ঝঁঢ়া বোবায় এমন শব্দ।

জ

জগৎ^১
জনপদ
জেদি

- পৃথিবী।
- যেখানে অনেক মানুষ এক সাথে বসবাস করে, লোকালয়, শহর।
- একগুঁয়ে, কোনো কাজ করতে যে নাছোড়বান্দা।

ট

টনটন
টহল
টেপা পুতুল

- যন্ত্রণা বোবায় এমন অনুভূতি।
- পাহারা দেওয়া।
- কুমাররা নরম এঁটেল মাটির ঢাক হাতে নিয়ে ঢিপে ঢিপে নানা ধরনের ও নানা আকারের পুতুল তৈরি করেন। ঢিপে ঢিপে তৈরি করা হয় বলে এসব পুতুলের নাম টেপা পুতুল। তবে এসব মাটির পুতুলের হাত-পা বা জোড়াগুলো একটু ভিজে ভিজে মাটি দিয়ে যন্ত্র করে লাগাতে হয়।

- ‘টেরা’ অর্থ মাটি, আর ‘কোটা’ অর্থ পোড়ানো। পোড়ামাটির তৈরি মানুষের ব্যবহারের সব রকমের জিনিস টেরাকোটা হিসেবে পরিচিত।
- গাঢ়, সুন্দর।
- কোনো বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া বা নেওয়া।

টেরাকোটা

টুকুটুক
ট্ৰেনিং

ড
ডনকুস্তি
ডিঙি
ড্রিবলিং

- বুকডন দিয়ে শরীরচর্চা আর শারীরিক শক্তির পরীক্ষা।
- একধরনের নৌকা।
- এটা ফুটবল খেলার একটা কৌশল। ইংরেজি dribble শব্দের অর্থ হলো পায়ে-পায়ে বল গড়িয়ে নিয়ে কৌশলে বল কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ত

তট
তটস্থ
তারারা
তিরিক্ষ
তুলকালাম কাণ্ড
তেষ্টা

- নদীর তীর।
- ব্যতিব্যস্ত।
- আকাশের তারকারাঙ্গি।
- খারাপ মেজাজ।
- এলাহি কাণ্ড।
- তৃক্ষণা, পিপাসা। তেষ্টায় যেন ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

দ

দাপটে
দুর্গ
দুর্ভেদ্য
দুঃসাহসী
দিগন্ত
দুর্ত গতিতে
দেশান্তর
দেলাই মাথা

- প্রবল প্রতাপের সঙ্গে।
- প্রাচীর বা দেয়াল ঘেরা সেনানিবাস।
- যা কফ্টে ভেদ করা যায়।
- অত্যধিক সাহস আছে এমন।
- প্রান্তরের শেষে আকাশ যেখানে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হয়।
- খুব তাড়াতাড়ি করে, জোরে যাওয়া।
- অন্য দেশ।
- মাথা নাড়াই।

ধ

ধরা
ন
নকশা

- পৃথিবী।
- রেখা দিয়ে আকা ছবি। শখের ইাঢ়ি, টেপা পুতুল বা পশুপাখির গায়ে গ্রামের কুমার শিঙারী নানা রঙের ছবি আঁকেন। এ ছবিগুলোই হলো নকশা।
- গভীর রাত্রি। মাৰা রাত।
- জনশূন্য স্থান।
- প্রমাণ, চিহ্ন বা উদাহরণ।
- কোনো রকম বিচার বিবেচনা ছাড়া।
- অন্যায়ের শিকার, নিপীড়িত।

প

পতন
পরম্পর
পরাধীন
পন্থা
পাত্তি
পর্যবেক্ষণ
পাখপাখালি
পাষ্ঠু
পাণ্ডিত্যপূর্ণ
পুটলি
প্রকৃতি
প্রাচীনতম
প্রান্তর
প্রতিবাদী
প্রতিধ্বনি
প্রবাসী
প্রবাহিত হওয়া
প্রবেশিকা/প্রবেশিকা পরীক্ষা

- পড়ে যাওয়া।
- একের সঙ্গে অন্যের।
- পরের অধীন, স্বাধীন নয়।
- পথ।
- কাপড়ের লম্বা টুকরা। এটা দিয়ে শরীরের কোনো স্থান বাঁধা থাকে।
- কোনো কিছু বা প্রাকৃতিক ঘটনা খেয়াল করে দেখা।
- নানা ধরনের পাখি।
- নির্দয়।
- জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ।
- বৌঁচকা।
- নিসর্গ।
- প্রাচীন হলো পুরাতন বা বহুকাল আগের কিছু। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলে তম যোগ করা হয়।
- মাঠ, জনবসতি নেই এমন বিস্তীর্ণ ভূমি।
- যে কোনো উক্তির বিরুদ্ধে যারা আপাত্তি জানায়।
- বাতাসে ধাক্কায় ধ্বনির পুনরায় ফিরে আসাকে প্রতিধ্বনি বলে।
- ভিন্নদেশে যে বাস করে।
- বয়ে চলা, গড়িয়ে গড়িয়ে চলা।
- আজকের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। প্রবেশিকা পাস করলে কলেজে প্রবেশ করা যেত। তাই নাম হয়েছিল প্রবেশিকা।
- প্রত্ন শব্দের অর্থ অতি পুরাতন বা প্রাচীন। এই সম্পর্কিত যে তত্ত্ব তাকে বলা হয় প্রত্নতত্ত্ব। তবে, প্রাচীন কালের জিনিসপত্র, মুদ্রা, অটোলিকা ইত্যাদি বিচার করে এবং ইতিহাস খুঁজে যা বের করা হয় বা যেতাবে বের করা হয় তাকে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক।
- উচ্চস্থান থেকে নিম্নস্থানে বেগে পতন।
- খোওয়া, পানি দিয়ে পরিষ্কার করা।

ଫ

ଫରମାଯେସ
ଫୁରସତ
ଫେରିଅଳା
ଫେଡ୍ରୋ
ଫୋଟୋ

- ହୁକୁମ, ଆଦେଶ ।
- ଅବସର, ଅବକାଶ, ଛୁଟି ।
- ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ବା ବାଡ଼ିତେ ସୁରେ ଯାରା ଜିନିସପତ୍ର ବିକିଳ କରେନ ।
- ଛିଡ୍ରୋ ।
- ପଞ୍ଚଫୁଟିଟ ହୟ, ଫୁଟେ ଓଠେ ।

ବ

ବରଣ
ବରକମ୍ପାଜ
ବଞ୍ଚ
ବଦ୍ର
ବଜାବର୍ଷୁ
ବର୍ଗି
ବରେଣ୍ୟ
ବାହାର
ବାରି
ବାନ୍ଦା
ବିଜୁ
ବିଜୟକୁଷ୍ଟ
ବିବିସି
ବିଲୁଙ୍ଗ
ବିଜ୍ଞାଦ
ବିସ-ନଜର
ବେଗାଭୂମି
ବେଶ୍-ବଳ
ବୈଚିତ୍ର୍ୟ
ବାଁଶେର କେଳ୍ପା

- ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ ।
- କମ୍ପୁକଥାରୀ ସିପାଇ ବା ରକ୍ଷୀ ।
- ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ କରେ ଘର୍ଡେର ଆକାଶେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକାଶ ପାଓଯା, ବାଜ ।
- ବର୍ଷା ।
- ଜାତିର ଜନକ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନେର ଉପାଧି ।
- ମାରାଠା ଦସ୍ୟ ।
- ମାନ୍ୟ ।
- ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ।
- ପାନି । (ଶବ୍ଦଟି ଶୁଦ୍ଧ କବିତାଯ ବ୍ୟବହୃତ ହୟ ।)
- ଗୋଲାମ; ଦାସ; ଏକାନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ।
- ଚାକମାଦେର ନବବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ।
- କୋନୋ କିଛି ଜୟ କରାର ପର ଯେ ସ୍ତର୍ତ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରା ହୟ ।
- ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟେର ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରେ ନାମ ।
- ଯା ଲୋପ ପେଯେଛେ ।
- ଖେତେ ମଜା ନୟ ଏମନ ।
- ହିଂସାଗୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, କୁନ୍ଜର ।
- ସମୁଦ୍ରେ ତୌରେ ବାଲୁମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ।
- ବୀଶବାଗାନ ।
- ବିଭିନ୍ନତା ।
- ବାଁଶ ଦିଯେ ତୈରି କେଳା ବା ଦୂର୍ଘ ।

ଶ

ଭୟଙ୍କର
ଭାସଣ

- ଭୀଷଣ, ଭୀତିଜନକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ।
- ବକ୍ତୃତା, ବିବୃତି, ଉତ୍କଳ ।

ମ
ମହାନବି

- ଆଲ୍ଲାହର ପଯଗମ୍ବର; ରାସୁଲ; ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷଦେର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିନି । ଶେଷ ନବି ହ୍ୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସ)-କେ ମହାନବି ହିସେବେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରା ହୟ ।

ମଜଲୁମ
ମହାନ
ମନସ୍ମୀ
ମହାକଳରବ

- ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ନିର୍ଯ୍ୟାତି ।
- ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମହେ, ଉଦାର ।
- ଉଦାରମନା ।

ମରଣ-ୟକ୍ରମାଣିକା

ମାୟାବତୀ

ମାଲିଶ
ମିଲିଟାରି
ମୁକ୍ତିକାମୀ
ମୁକ୍ତିବାହିନୀ
ମୁକ୍ତିବ୍ୟାକ୍ରମା
ମୁଖ
ମେଦିନୀ
ମୋହ
ମୃଦୁଶିଳ୍ପ

- କଲରବ ଶଦେର ଅର୍ଥ ଅନେକ ମାନୁଷେର ଗଲାଯ ଏକ ସାଥେ ଚେଁଚାମେଟି,
ଆୟାଜ ; ମହାକଳରବ ଅର୍ଥ-ଭୀଷଣ ଚିତ୍କାର, ଚେଁଚାମେଟି ।
- ମୃତ୍ୟୁର କଟ୍ଟ ।
- ଦୟା, ମମତା ଆହେ ଯେ ନାରୀର ।

- ଯେ ଓସୁଧ ବା ମଲମ ଚେପେ-ଚେପେ ଶରୀରେ ଲାଗାତେ ହୟ ।

- ସାମରିକ ବାହିନୀ । ଗଲେ ପାକିସ୍ତାନି ହାନାଦାର ବାହିନୀକେ ବୋବାନୋ ହେଯେଛେ ।

- ସାଧୀନତାକାମୀ ।

- ଶତ୍ରୁର ଦଖଲ ଥେକେ ଦେଶକେ ରକ୍ଷା କରାର ଜନ୍ୟ ଲଡାଇ କରେଛିଲ ଯେ ସେନାଦଲ ।

- ଯିନି ସାଧୀନତା ବା ମୁକ୍ତିର ଜନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରେନ ।

- ବିମୋହିତ, ଆନନ୍ଦିତ ।

- ଭୂପୃଷ୍ଠ, ପୃଥିବୀ ।

- ଅଞ୍ଜନ, ମାୟା, ମୂର୍ଖ ।

- ମାଟିର ତୈରି ଶିଲ୍ପକର୍ମକେ ଆମରା ବଲି ମାଟିର ଶିଲ୍ପ ବା ମୃଦୁଶିଳ୍ପ । ଆମାଦେର

ଦେଶେର ସବଚେଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଲ୍ପ ହଚ୍ଛେ ମୃଦୁଶିଳ୍ପ ।

- ବିଖ୍ୟାତ, କୀର୍ତ୍ତିମାନ ।

- ଆରବି ବହରେର ଏକଟି ମାସେର ନାମ ।

- ଅନ୍ୟୁଗ ବା ସମୟ ।

ସ

ସମସ୍ତୀ
ସିଲକାଦ
ସୁଗାନ୍ତର

ର

ରମେଲ
ରକ୍ତରଙ୍ଗିତ
ରକ୍ଷୀ
ରାଜପ୍ରାସାଦ
ରକ୍ଷମୂର୍ତ୍ତି

ଲ

ଲବେଜାନ

ଶ

ଶଖ
ଶଥେର ହାଁଡ଼ି

ଶକ୍ତିଧର
ଶକ୍ତିକତ
ଶବ୍ଦଦୂସଣ
ଶାଲବଳ ବିହାର

ଶାହନଶାହ
ଶାହଜାଦା

ଶାୟିତ
ଶାୟେସ୍ତା
ଶିର
ଶିଳ୍ପୀ

ସ

ସଂକଳନ
ସରକାର
ସମତଳ ଭୂମି
ସମସ୍ତରେ
ସମ୍ମେଲନ
ସମାବେଶ
ସାର୍ଥକ
ସାଂହାରୀ
ସିଦ୍ଧୁ
ସେର
ମେହ-କଣ
ସ୍ଵାଦ
ସ୍ଵଜନ
ସ୍ଵର୍ଗତା

ସୌଭାଗ୍ୟ
ସମ୍ଭାବ
ସ୍ମୋତସ୍ତିନୀ

ହ

ହାନାଦାର
ହୁଙ୍କାର
ହଜ

ହିଜରି

- ରାଜକୀୟ ।
- ରକ୍ତ ଦିଯେ ଲାଲ କରା ହେବେ ଯା ।
- ପହରୀ, ସେନା ।
- ରାଜପୂରି ବା ରାଜବାଡ଼ି ।
- ଉତ୍ତରପ ।
- ହୟରାନ ।

- ମନେର ଇଚ୍ଛା, ଝୁଟି ।
- ଶଥ କରେ ପର୍ବତୀର ଜିନିସ ଏହି ସୁନ୍ଦର ହାଁଡ଼ିତେ ରାଖା ହେ, ତାଇ ଏର ନାମ ଶଥେର ହାଁଡ଼ି ।
- ଶକ୍ତି ଆଛେ ଯାର ।
- ଭୀତ ।
- ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋଲାହଲେ ଶବ୍ଦଦୂସଣ ଘଟେ ।
- କୁମିଳାର ମୟନାମାତିତେ ମାଟି ଖୁଡ଼େ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବେ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତାର ନିଦର୍ଶନ । ଅଟ୍ଟାଦଶ ଶତକେର ଏହି ପୁରାକୀର୍ତ୍ତ ବାଲ୍ମୀଦେଶେର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚାୟକ । ଶାଲବଳ ବିହାରେ ପାଓୟା ଗେଛେ ନାନା ଧରନେର ପୋଡ଼ାମାଟିର ଫଳକ ।
- ବାଦଶାହ, ରାଜାଧିରାଜ ।
- ବାଦଶାହ ପୁତ୍ର ।
- ଶୁଯେ ଆଛେ ଏମନ ।
- ଶାସ୍ତି, ଜନ୍ମ ।
- ମାଥା ।
- ଯିନି କୋନୋ ଶିଳ୍ପକଳାର ଚର୍ଚା କରେନ ତିନିଇ ଶିଳ୍ପୀ । ଯେମନ- ସଜ୍ଜୀତଶିଳ୍ପୀ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ।

- ପ୍ରତିଜ୍ଞା ।
- ଦେଶ ଚାଲାଯ ଯେ ।
- ଯେ ଜ୍ଞମି ଉତୁନିଚୁ ନୟ, ପାହାଡ଼ି ନୟ, ତାକେଇ ସମତଳ ଭୂମି ବଲେ ।
- ଏକସଙ୍ଗେ ଶବ୍ଦ କରା ବା କଥା ବଲା ।
- ଜଳସମାବେଶ ।
- ଏକତ୍ରେ ଅବସ୍ଥାନ ।
- ସଫଳ ।
- ରାଖାଇନଦେର ନବବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ।
- ସାଗର ।
- ପୁରାନୋ ପଞ୍ଚତିର ଉଜନ ମାପାର ଏକକ (୧ ସେର= ପ୍ରାୟ ୦.୯୩୫ କେଜି) ।
- ଆଦର
- ଥେତେ ଭାଲୋ ଲାଗେ ଏମନ ।
- ନିଜେର ଲୋକ, ଆଜ୍ଞାଯ, କର୍ମ୍ବାଳ୍ୟବ ।
- ସୋନାଲି ରଙ୍ଗେ ବୁନେ ଲତା । ଅନେକ ସମୟ ପଥେର ଧାରେର ଗାଛଗାଛାଳି ଡରେ ଥାକେ । ଏହି ଲତା ଆପନା-ଆପନି ଜନ୍ମାଯ ।
- ଭାଲୋ ଭାଗ୍ୟ ।
- ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିସ ।
- ନଦୀ ।

- ଆକ୍ରମଣକାରୀ ।
- ଚିତ୍କାର ।
- ହିଙ୍ଗର ଜିଲ୍ଲାର ୧ ତାରିଖେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ଇହରାମ ବେଁଧେ ମଙ୍କାର ଅଦୂରବତୀ ଆରାଫାତ ମୟଦାନେ ଅବସ୍ଥାନ ଓ ପରେ କାବାର ତତ୍ତ୍ଵାଫ ସଂବଲିତ ଇସଲାମି ଅନୁଷ୍ଠାନ ।
- ଯିଶୁଖିଷ୍ଟେର ଜଳେର ୬୨୨ ବର୍ଷ ପରେ ହେବେ ଯୁହାମ୍ବଦ (ସ)-ଏର ମଙ୍କା ତ୍ୟାଗ କରେ ମଦିନାଯ ଗମନେର (ହିଜରତେର) ଦିନ ଥେବେ ଗଣିତ ଚାନ୍ଦ ଅଦ ବା ବର୍ଷ ।

২০১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য, মে-বাংলা

পরনিন্দা ভালো নয়

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য